বিবেকানন্দর আর্যভাবনা

কনিষ্ক চৌধুরী

(১)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে প্রায় সারা ভারতে হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী একটি শক্তিশালী প্রবাহের আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতের রাজধানী কলকাতাও তার থেকে মুক্ত ছিল না। ভূদেব–বঙ্কিমের পাশাপাশি রামকৃষ্ণ–বিবেকানন্দের ভূমিকাটি ছিল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। বৈদিক ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, আত্ম র্যত্ব, ভারতীয়ত্ব নিয়ে যে উন্মাদনার আবির্ভাব ঘটেছিল উনিশ শতকে বাংলার বাইরে তার অন্যতম প্রধান কারিগর ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮১৪–১৮৮ ৩)। সারা জীবন ধরে তিনি বৈদিক হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য প্রভাবের তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আর্যসমাজ'–এর লক্ষই ছিল বৈদিক সমাজে প্রত্যাবর্তন। এ ছিল ইতিহাসের দিক থেকে পিছু হটা। বিবেকানন্দের চলাচল ছিল এপথেই। যদিও তা কথকিঞ্চিৎ ভিন্ন ভঙ্গীমায়। কিন্তু মূল ভাবনাটি প্রায় একই রকম অর্থাৎ আর্য ধর্ম ও জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন।

বিবেকানন্দ ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' শীর্ষক বক্তৃতায় বলেছিলেন, ''সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোনো জাতি নাই।'' (২০১২৫১৪৫)। শুধু এইটুকু বলেই যদি থামতেন, তাহলে সমস্যাটা অপেক্ষাকৃত কম হত। কিন্তু তিনি তা না করে আরও বহু কথা বহু স্থানে বলেছেন, যা জন্ম দিয়েছে বহুবিধ সমস্যার, অকারণ জটিলতার এবং অবশ্যই স্ববিরোধিতার। এ প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের মধ্যে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে।

১) আর্যগণ (জাতি অর্থে) বহিরাগত। (২০১২৪২০১)।
২) আর্যগণ (জাতি অর্থে) বহিরাগত নয়, ভারতের আদি বাসিন্দা। (২০১২৬১৬৪)
৩) আর্যরা বহিরাগত না ভারতের আদি বাসিন্দা তা জানা আর সম্ভব নয়। (২০১২৬২৪)। তা জানা না গেলেও কোন ক্ষতি নেই কারণ ভারতবাসী প্রকৃত অর্থেই আর্য। এখানে আর্য ছাড়া অন্য কোন জাতি নেই। (২০১২৫১৪৫)।

(২)

বিবেকানন্দর এই ধারণা গড়ে ওঠার একটা প্রেক্ষাপট আছে। তাঁর আর্যভাবনার শিকড়টি রয়েছে উনিশ শতকে 'প্রাচ্যদেশীয় নবজাগরণ'[১] এবং ভারতীয় দ্বিখন্ডিত সংস্কৃতি, রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিক ভাবধারার মধ্যে। আঠারো শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশ সহ গোটা ভারতে ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানির ঔপনিবেশিক আধিপত্য স্থাপনের কাজটি যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে শুরু হওয়ায় কোম্পানির অফিসার (শাসক) দের প্রয়োজন পড়েছিল ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনুসন্ধান ও চর্চা। এর পিছনে কারণগুলি হল প্রথমত, প্রায় অজ্ঞাত এই সভ্যতার শাসক হিসাবে শাসিতদের সংস্কৃতি জানার কৌতুহল। দ্বিতীয়ত, উপনিবেশের ইতিহাস না জানা থাকলে সমাজের উপর দৃঢ় আধিপত্য স্থাপন করা কঠিন। তাই সেখানকার ইতিহাস যেমন জানতে হবে তেমনি ইতিহাস খুঁজে বের করে নিজেদের প্রয়োজন মতো গড়ে নিতে হবে। আরও সুস্পষ্টভাষায় সাম্রাজ্যবিস্তারের হাতিয়ার হিসাবে প্রয়োজন পড়লো ঔপনিবেশিক সমাজকে জানার, ইতিহাস চর্চা করার।

টীকা ১। উনিশ শতকে সমগ্র ইউরোপে এক দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে প্রাচ্যকে জানতে পারলে পুনরায় এক নবজাগরণের ঢেউ আসবে এবং নবজাগরণের সে জ্ঞানে নব দিশা উন্মোচিত হবে।

Scholar, R. 1984 (translated). The Oriental Renaissance : Eurupe's Rediscovery of India and the East, 1680-1880. New York : Columbia University Press.

থাপার কর্তৃক উল্লেখিত, থাপার, রোমিলা, 2011:5

এইভাবে জ্ঞান নিরূপিত হল ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে। (থাপার, ২০১১৩)।

প্রাচ্য সংক্রান্ত এই আগ্রহ আরো বৃদ্ধি পায় যখন আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ শতকের শুরুতে একগুচ্ছ প্রাচ্য গবেষণা ও অনুবাদ গ্রন্থ ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্‌দের হাতে পৌঁছায়। শুরুতেই যার নাম করতে হয় তিনি হলেন উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬–১৭৯৪)। ষোলো শতকের এক ইতালীয় বণিক ফিলিপ সসেটি দাবী করেন যে, সংস্কৃত ও ইউরোপের কয়েকটি ভাষার মধ্যে বেশ কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে। (থাপার, ২০১১৩)। এই জাতীয় দাবী উইলিয়াম জোন্স ও তাঁর সহযোগীদের যথেষ্ট উৎসাহিত করে। উইলিয়াম জোন্স লক্ষ্য করেছিলেন যে গ্রীক-রোমান দেব-দেবীদের সাথে হিন্দু দেব-দেবীদের এক সমান্তরাল সম্পর্ক রয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ বাইবেল ও হিন্দু পৌরাণিক আখ্যানের এক তুলনামূলক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি গুরুত্ব দিতে শুরু করেন বিভিন্ন ভাষার তুলনামূলক পাঠের উপর। এই প্রসঙ্গে জোন্স যে সিদ্ধান্তে আসেন তা হল ''সংস্কৃত ভাষার প্রাচীনত্ব যাই হোক না কেন সংস্কৃতের গঠন অপূর্ব, গ্রিক ভাষার তুলনায় সংস্কৃত অনেক বেশি নিখুঁত, ল্যাটিনের চেয়ে শব্দ প্রাচুর্য অনেক বেশি, আর এই দুই ভাষার চেয়েও পরিশীলিত। তবুও ক্রিয়ার মূল ও ব্যাকরণগত গঠনের ক্ষেত্রে দুটি ভাষার সঙ্গেই সংস্কৃতের এমন গভীর সাদৃশ্য বর্তমানে এতটাই তীব্র যে এরা এমন কোনো সাধারণ উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে তা সম্ভবত এখন যার আর অস্তিত্ব নেই— একথা বিশ্বাস না করে কোনো ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এই তিন ভাষার বিচার করা সম্ভব নয়। এতটা জোরালো না হলেও একই কারণে অনুমান করা যায় গথিক ও কেল্টিক ভাষায় ভিন্নরীতির বাক্-ধারার সংমিশ্রন ঘটলেও উভয়ের উৎস সংস্কৃতের সঙ্গে অভিন্ন। যদি পারসিকের প্রাচীনত্ব সম্পর্কিত কোনো কোনো প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে প্রাচীন পারসিকের একই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।'' (জোন্স। ২০১১২৭)।

বিভিন্ন ভাষার এই তুলনামূলক আলোচনা ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ভাষাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঘটায়। উনিশ শতকের শুরুতেই বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলি ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গের হাতে আসতে শুরু করে। এর ফলে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চা আরও উৎসাহিত হয়। এই ভাষাতত্ত্ব চর্চার মধ্যে দিয়ে পন্ডিতবর্গ যে ধারণায় পৌঁছাতে চেষ্টা করেন তা হল— এই ভাষাগুলি (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, পারসিক) একটি আদিভাষা সঞ্জাত। এই ধরণের প্রচেষ্টা তাঁদের আবার জাতি ধারণা গঠনের দিকে প্রানীত করেছিল। অর্থাৎ ভাষাতাত্বিক চর্চার অঙ্গনে 'আর্য' শব্দটির বহুল ব্যবহার জাতি ধারণার সাথে সংযুক্তির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ''ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা থেকে উদ্ভূত অন্য ভাষা যে সব গোষ্ঠীর কথ্য ভাষা তাদের প্রথম দিকে অন্য নামকরণ হলেও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে 'আর্য' নামে অভিহিত করাই যুক্তি সংগত বলে মনে হয়। ... ভাষাতাত্বিকদের কাছে 'আর্য' একপ্রকার ভাষা এবং এর অর্থ 'An Aryan-Speaking Person' অথবা 'আর্যভাষার কথা

বলতে অভ্যস্ত ব্যক্তি' (থাপার। ২০১১৫)। 'আর্য' শব্দটির ক্রমাগত ব্যবহার পরবর্তীকালে জাতি ধারণার সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে।

উনিশ শতকে ইউরোপে বিশেষ করে জার্মানীতে নিজেদের উৎস ও আত্মপরিচয় জানার জন্যে এক ধরনের আগ্রহ তৈরী হয়। এই আগ্রহ জন্ম দেয় 'আর্য ভাষা' থেকে 'আর্য জাতি'র ধারণার রূপান্তর। আর্যগণকে দুইভাগে বিভক্ত করা হল— এশিয় এবং ইউরোপীয়। এশিয় আর্যগণের আদি বাসভূমি যেমন মধ্য এশিয়া, তেমনি ইউরোপীয় আর্যগণের উদ্ভব উত্তর ইউরোপে (থাপার। ২০১১৭)।

ভারতীয় আর্য ধারণা গঠনের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ ম্যাক্স মূলারের (১৮২০–১৯০০) একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। তিনি বৈদিক সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ভারতীয় সভ্যতাকে বিচার করেছিলেন। তাঁর মতে, ঋগ্বেদ ছিল ইন্দো-ইউরোপীয়দের প্রাচীনতম স্তর এবং তাই পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য (পূর্বোক্ত ৪)। তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ার কোন স্থানে, যেখান থেকে আর্যভাষী মানব গোষ্ঠী দুই দিকে ছড়িয়ে যায় (Max Muller. 1862, 1883, 1888)। এদের মধ্যে একটি গোষ্ঠী ইউরোপে পৌঁছায় এবং অন্য আর একটি গোষ্ঠী চলে যায় ইরানে। এই ইরানীয় গোষ্ঠীর বিভাজিত একটি অংশ আবার ভারতে আগমন করে। ম্যাক্স মূলার এইভাবে ভাষা ও জাতির সমীকরণ করে, শেষ পর্যন্ত বাংলাকে আর্যভাষা এবং বাঙালীদের আর্য বলেও দাবী করেন। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে রামমোহন রায় সম্পর্কে তিনি বলেছেন, ''রামমোহন রায় আর্যজাতির দক্ষিণপূর্ব শাখার মানুষ এবং আর্যভাষা বাংলা, তাঁর মাতৃভাষা... রামমোহন রায়ের ইংল্যান্ডে অভ্যাগমন যেন আর্যজাতির দুই মহৎ শাখার মধ্যে মিলন ঘটাল, যারা নিজেদের এক উৎস, এক ভাষা, এবং এক বিশ্বাস ভুলে এতকাল পৃথকভাবে কাটিয়েছে (ম্যাক্স মুলার ১৮৮৪১১)।

ইউরোপে আর্য উৎপত্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে ইউরোপীয় ও ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যবর্তী সেমিটিক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ ও তাদের ভাষা বাতিল হয়ে যায়। ম্যাক্স মূলারের মতে, ভারতীয় সভ্যতার গঠন প্রক্রিয়ায় সেমিটিক জাতির বহির্ভূত হওয়ার অর্থ পরবর্তীকালে ইসলামীয় প্রভাবের অন্তর্ভুক্তি না হওয়া। ম্যাক্স মুলার ভারতবর্ষে মুসলিম শাসনকে অত্যাচারী বলে বর্ণনা করলেও কেন যে এই শাসন অত্যাচারী তার কোন ব্যাখ্যা দেন নি। কিন্তু তাঁর এই উক্তি প্রায়শ ব্রিটিশ পন্ডিতবর্গ ব্যবহার করতেন। তারা আকাঙ্খা পোষণ করতেন যে, নিপীড়নকারী মুসলিম শাসনের হাত থেকে হিন্দুগণ যে রেহাই পেয়েছে এবং পরিবর্তে হিতৈষী ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে স্থান করে নিয়েছে সে জন্য আশা করা যায় হিন্দুরা তাঁদের উপযুক্ত সমঝদার হবে (এলিয়ট এবং ডসন 1, xxii)। এই তত্ত্বের প্রেক্ষাপটে ভাষা ও জাতির সমীকরণ মূলত দায়ী। আর্যদের জয়লাভের অর্থ একদিকে যেমন ইন্দো-আর্য ভাষার জয়, তেমনি অপরদিকে বিশিষ্ট আর্য সভ্যতার সফল অনুপ্রবেশ (থাপার ২০১১৯)।

ম্যাক্স মূলারের এই বর্হিদেশীয় জাতিতত্ত্বকে কেশবচন্দ্র সেন, রমেশচন্দ্র দত্ত, বালগঙ্গাধর তিলক, ভূদেব মুখোপাধ্যায় আর্যধারণা গ্রহণ করেছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। কেশবচন্দ্র সেন একসময় মন্তব্য করেছিলেন যে, ''...ইংরাজ জাতির ভারতবর্ষে আগমনের ফলে আমরা যেন দুই বিচ্ছিন্ন ভ্রাতার মিলন দেখতে পাই, যারা সুপ্রাচীন আর্যজাতির অন্তর্গত দুই পৃথক পরিবারের উত্তরাধিকার'' (থাপার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১১৪)। উপনিবেশিকগণ ও ভারতীয় সমাজে উচ্চকোটির মানুষের মধ্যে মৌলিক উৎপত্তির এই তত্ত্ব এক দৃঢ় সংযোগ স্থাপন করে।

বালগঙ্গাধর তিলক ম্যাক্স মূলারের উপর যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান হলেও, তিনি ভাষাতত্ত্ব অপেক্ষা জ্যোতির্বিজ্ঞানের উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিলকের দাবী অনুযায়ী, বৈদিক আর্য্যর্গণের পূর্বপুরুষগণ এবং বেদ-এর বিষয়বস্তুর উৎপত্তি প্রাচীনকালে খ্রিষ্টপূর্ব ১০,০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৮০০০ অব্দ নাগাদ তাদের আদি বাসভূমি উত্তর মেরু অঞ্চলে। তিলকের এই দাবী সম্পর্কে মাধব এম দেশপান্ডের মন্তব্যটি এখানে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ঃ

''তিলক নির্নীত বেদ-এর সময়পর্ব এবং বৈদিক আর্যগণের পূর্বপুরুষ বিষয়ক তাঁর মতামত যদি মেনে নেওয়া হয়, তবে এটাও মানতে হবে যে, ইন্দো-আর্য শাখা অপেক্ষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর, সংস্কৃত ব্যতিরেকে, অন্যান্য ভাষা তুলনায় যথেষ্ট নবীন। এই সিদ্ধান্তের ফলে ঔপনিবেশিক পশ্চিমী আর্যগণের ভ্রাতাস্বরূপ ভারতীয় আর্যগণ যে প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা প্রবীন তা প্রমাণিত হয় যা আবার জাতীয় গর্ব বৃদ্ধির সুযোগ দান করে। তিলক কিন্তু কিভাবে ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সকল ভাষার উৎসস্থল সংস্কৃত ভাষা বলে মনে করেছেন তার কোন সুসংবদ্ধ ব্যাখ্যা দেন নি। স্পষ্টত না জানলেও সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই যে প্রাচীনতম তা তিলক দাবি করেছেন এবং এর ফলে সংস্কৃত ভাষাই সমস্ত ভাষার সম্ভাব্য জননীরূপে প্রতিভাত হয়'' (দেশপান্ডে ২০১১৯২)।

উনিশ শতকের শেষভাগে যে জাতীয়তাবাদের আর্বিভাব ঘটেছিল, এই দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে তা সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। অর্থাৎ আর্যভাষা থেকে আর্যজাতির সমীকরণ এবং সংস্কৃতকে সমস্তভাষার জননী হিসেবে দেখা। আরও সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই এই ভাবনা সবচেয়ে প্রসারিত, বিকশিত ও গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। কারণ তা ছিল তাদের সামাজিক অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্রুত সমাজ বদলের স্বপ্নে তারা তাদের আত্ম পরিচয়ের সন্ধান চালিয়েছেন। খুঁজছিলেন তাদের সামাজিক অবস্থানের বৈধতা। এবং তা পেয়েও গেলেন প্রাচীনযুগের ইতিহাসের মধ্যে। দয়ানন্দ সরস্বতী, নারায়ণ পাগবী (১৮৯৩) এবং বিবেকানন্দর রচনায় ও বক্তৃতায় উঠেছিল সুপ্রাচীন অতীতের কথা, আর্যজাতির ভারতীয় উৎস অনুসন্ধান, বৈদিক যুগের গরিমা এবং সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের কথা।

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮১৪–১৮৮৩) এই ভাবনা দ্বারা ভাবিত হয়েই তৈরী করলেন 'আর্যসমাজ'। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল বৈদিক সমাজে ফিরে যাওয়া। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দর সাথে তাঁর মতের কিছুটা সাদৃশ্য দেখা যায়। তিনি মনে করতেন বেদ রচয়িতা আর্যগণ তিব্বত থেকে ভারতে এসে পৌঁছায়। বর্তমান উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ হলেন আর্য। তিনি বিশ্বাস করতেন— বেদ সর্বপ্রকার জ্ঞান, এমন কি আধুনিক বিজ্ঞানেরও জনক। আর্যদের জাতিগত এবং ভাষাগত শুদ্ধতার উপর তিনি বিশেষ জোর দেন এবং আর্যসমাজকে 'আর্যজাতির সমাজ' বলে বর্ণনা করেন। আর্যগণ উচ্চবর্ণভূক্ত। দলিতগণ এই ব্যবস্থার অন্তর্গত ছিল না— যদিও তারা চাইলে 'শুদ্ধি' নামক ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের

উচ্চবর্ণে অন্তর্ভুক্ত করা হত। প্রকৃতপক্ষে এই 'শুদ্ধি' ক্রিয়ার ভাবনা উচ্চবর্ণের মানুষের ঘৃণার এক বহিঃপ্রকাশমাত্র (থাপার ২০১১১৪–১৫)।

ভারতে সমস্ত রকমের পাশ্চাত্য প্রভাবের তিনি ছিলেন তীব্র বিরোধী। ব্রাহ্ম আন্দোলনের তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন। কারণ এই আন্দোলনটি ছিল পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। ব্রাহ্মসমাজের শিক্ষামূলক সাহিত্য খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, নানক, চৈতন্য এবং মহম্মদের স্থান ছিল। তাঁর মতে— এ সবই ভারতের অর্থাৎ 'আর্যাবর্তের' ঐতিহ্য বিরোধী।

এই ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গী ইন্দো-ইউরোপীয় গোষ্ঠীর আধুনিক জ্ঞানচেতনা এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে যে নবতর চেতনার নির্মাণ করে তার প্রতিফলন দেখা যায় তিলকের সমসাময়িক নারায়ণ পাবগীর রচনায়। তিলক যখন বৈদিক আর্যগণের আদিবাসভূমি আর্কটিক বা উত্তর মেরু অঞ্চলে বলে দাবী করেছেন, তখন পাগবী দাবী করেছেন, আর্যগণের আদি বাসস্থান ছিল আর্যাবর্তেই— যদিও আর্যাবর্তে বসবাসকারী আর্যগণের একটি শাখা সুমেরু অঞ্চলে অভিবাসন করলেও শেষাবধি তারা পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করে বলে তিনি মনে করতেন। আর্যাবর্তই আর্যগণের আদিবাসভূমি— এই বিশ্বাসে পাগবী, আর্যগণ যে ভারতে বহিরাগত জাতি সে ধারণার বিপক্ষে সওয়াল করেন। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তিনি দাবী করেন যে, আর্যাবর্ত থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আর্যগণ ছড়িয়ে পড়ে এবং তাই সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর সমস্ত ভাষার মাতৃস্বরূপা।

পাগবীর 'ভারতীয় সাম্রাজ্য' (১৮৯৩) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড হল 'দ্য আর্যান পিপল অ্যান্ড দ্য ওয়েলথ্ অফ দেয়ার ইনটেলিজেন্স'। এই রচনায় তিনি দাবী করেন যে, মনুষ্য প্রজাতির সর্বপ্রধান গ্রন্থ হল বেদ এবং শুধু আর্যগণের নয়, উত্তর ভারতে যে সমগ্র মনুষ্য প্রজাতির আদিবাসভূমি ছিল, বেদ সেই ধারণাকে পুষ্ট করে (পাগবী ১৮৯৩২। দেশপান্ডে কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১৯৩)। 'ভারতীয় সাম্রাজ্য' (১৯০০)-র নবম খন্ডে তিনি ঘোষণা করেন, ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে আর্যাবর্তই হল সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তিস্থল এবং সংস্কৃতই সমস্ত আর্যভাষার মাতৃস্বরূপা। সমস্ত ভাষা, যথা— মারাঠী, হিন্দি, বাংলা, গুজরাটি, ইরানীয়, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান, ইংরাজী ও পোলিশ ভাষার জন্ম সংস্কৃত ভাষা থেকে (পাগবী, ১৯০০১৪। দেশপান্ডে কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১৯৪)। তিনি দেখান যে, প্রকৃত আর্যগোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখা নিজস্ব ধর্ম ও জাতি ত্যাগপূর্বক আদি বাসভূমি ছেড়ে চলে যায়, যার ফলে আর্যভাষার বিভিন্ন শাখার উৎপত্তি ঘটে (পূর্বোক্ত১৬, পূর্বোক্ত৯৪)। লক্ষ্য করার বিষয় হলো, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ভিত্তি কোন ভাষা বা প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা বা গবেষণা নয়, বরং তিনি প্রায় সম্পূর্ণভাবেই স্মৃতি ও পুরাণের উপর নির্ভর করেছিলেন।

১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে মাদাম ব্লভাৎস্কি ও কর্ণেল ওলকট 'থিয়োসফিকাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা করেন। ব্লভাৎস্কি ও ওলকট আর্য শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রচার করার পাশাপাশি এটাও বলতে থাকেন যে, আর্যগণ হল আধুনিক হিন্দুদের পূর্বপুরুষ, ভারতবর্ষের দেশজ মানুষ এবং ইউরোপীয় সভ্যতার জনক (থাপার ২০১১১৫)। ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই ধারণা জার্মান রোমান্টিসিজমের প্রাথমিক চিন্তার ফসল। একদিকে প্রাচ্য ধর্মের এক বলয় এবং অন্যদিকে তার সঙ্গে ভারতীয় ধর্মচেতনা ও ইউরোপের বস্তুবাদের মধ্যের দোলাচল এই অধ্যাত্মবাদ বা থিয়সফির উত্থানে সহায়ক হয় (পূর্বোক্ত)।

এইভাবে আত্মপরিচয় খোঁজার প্রচেষ্টাটি আর্য খ্যাপামির কানাগলিতে হারিয়ে যায়। ভাষা গোষ্ঠীকে ভ্রান্তভাবে উপজাতি হিসেবে চিহ্নিত করা এবং প্রাচীন ভারত সম্পর্কে বিশেষ করে বেদ ও সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে মোহান্ধতা জাতীয়তাবাদের ধারণার সাথে মিলেমিশে এক বিচিত্র ধারণার জন্ম দেয়। যাকে সুনীতি কুমার আর্যামি বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এ খ্যাপামি থেকে কেশব সেনের মত বিবেকানন্দও মুক্ত হতে পারেননি। আর তার ফলে বিবেকানন্দ পাগবীর মতই আর্যদের দেশজ বলে চিহ্নিত করেছিলেন এবং বেদকে আদি সাহিত্যের শিরোপা দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত ও ধারণাগুলির পিছনে কেন ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমান উপস্থিত করার তাগিদ বিবেকানন্দ অনুভব করেননি। পাগবীর মতই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি ইত্যাদিই ছিল একমাত্র উৎস। বিষয়টি যথা সময়ে উত্থাপিত হবে। উনিশ শতকের বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮–১৯০৯) ম্যাক্স মূলারকে অনুসরণ করে আর্যজাতির আদি নিবাস, ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা এইরকম

''প্রথমত, আর্য্য জাতিদিগের দুইটি প্রবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ভারতবর্ষাভিমুখে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এবং আর একটি ইয়ুরোপের অভিমুখে অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম দিকে। এই দুইটি প্রবাহের সংযোগস্থল, আসিয়া [এশিয়া] মহাদেশ।''

''দ্বিতীয়ত, প্রাচীনতম কালের সভ্যদেশসমূহ আসিয়া [এশিয়া] খন্ডেই অবস্থিত। আর্য্য ভাষাসমূহের মধ্যে ঋগ্বেদের ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সুতরাং আসিয়া [এশিয়া] খন্ডের মধ্যে, এবং ঋগ্বেদের জন্মস্থান পঞ্জাব প্রদেশ হইতে অনতিদূরে কোনও প্রদেশে আর্য্যজাতির আদিম বাসস্থান হওয়াই সম্ভব।''

''তৃতীয়ত, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে মধ্য আসিয়া [এশিয়া] হইতে বার বার অনেক পরাক্রান্ত জাতি উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ মহাদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর হূণজাতি ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোগল জাতি তাহার উদাহরণ স্থল। অতএব, প্রাচীনকালেও আর্য্যগণ মধ্য আসিয়া [এশিয়া] হইতে উদ্ভূত হইয়া ইয়ুরোপ বিজয় করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়।''

''চতুর্থত, যদি ইয়ুরোপ, বিশেষতঃ স্ক্যান্ডেনেভিয়া হইতে আর্য্যজাতির উৎপত্তি হইত, তাহা হইলে, আর্য্য ভাষাসমূহের সমুদ্র সম্বন্ধীয় বহুসংখ্যক সাধারণ শব্দ পাওয়া যাইত। এই সকল ভাষায় পশুবিশেষ বা পক্ষিবিশেষ সাধারণ নাম যাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ভাষায় সমুদ্র বা জলচর জীবের সাধারণ নাম যাওয়া যায় না।'' (দত্ত, রমেশচন্দ্র, ২০০১৫২)

ম্যাক্স মূলারের এই ভাষা ও জাতিকে এক করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গীটি রমেশচন্দ্র দত্ত গ্রহণ করলেও, প্রাচীন বৈদিক আর্যদের সম্পর্কে তিনি কোন ভ্রান্ত মোহজালে জড়িয়ে পড়েননি বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে প্রাচীন অতীত ইতিহাস চর্চা করেননি। এখানেই বিবেকানন্দের সাথে তাঁর চিন্তাগত পার্থক্য। রমেশচন্দ্র দত্ত ভারত ইতিহাসচর্চা করেছিলেন যুক্তিবাদের ভিত্তিতে, নির্মোহভাবে। এখ

ানেই তাঁর কাজের সার্থকতা ও সাফল্য। যদিও বেশ কিছু ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তগুলি ঐতিহাসিক কালগত কারণে সীমাবদ্ধ ছিল। কারণ তখনও মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার উৎখনন হয়নি। প্রাগার্য এই সভ্যতার আবিস্কার ভারতের ইতিহাস চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উত্থাপিত হয়। রমেশচন্দ্র দত্তের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর উপর ভরসা রেখে বলা যায় যে, তার সময়ের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার আবিস্কার সম্ভব হলে, তাঁর চর্চা আরওবেশি সম্পূর্ণতা লাভ করতো।

উনিশ শতকের এই আর্য ধারণা উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বনিয়াদ হিসেবে কাজ করেছিল। এই ধারণাকে কেন্দ্র করে আর্বিভাব ঘটেছিলো এক ধরনের গোঁড়ামি পূর্ণ চিন্তাধারা। যার হাত ধরেই পরবর্তীকালে যে জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় সেখানে হিন্দু ছাড়া বাকী সকলের ক্ষেত্রেই চলে exclusion প্রক্রিয়া। যা সেকুলার জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, নিবেদিতা, তিলক, অরবিন্দ প্রমূখ হলেন এর প্রধান কারিগর। এই পর্বের আর্য ধারণা সংক্রান্ত গোঁড়ামির সমালোচনা করে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

''আমাদের দেশের একটি বিশিষ্ট মত যা শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত অধিকাংশ লোককে অভিভূত ক'রে আছে, সেটার নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্য্যামি', এই জিনিসটি অতি হালের, গত শতাব্দীর [উনিশ শতকের] ভাষাতত্ত্ব আর প্রত্নতত্ত্ব আলোচনায় এর উদ্ভব, রাজার জাতের সঙ্গে জ্ঞাতিত্ব কল্পনার পুলকে, পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে সাকুল্য লাভের আশায় এর প্রসার। ... আমাদের হিন্দু সভ্যতাটা যে একটা মিশ্র ব্যাপার, তা সর্ববাদিসম্মত। নামের মোহে প'ড়ে হিন্দু সভ্যতা গড়তে অনার্যের সাহায্যকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করলে চলবে না। রামেন্দ্রসুন্দর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা এই প্রকার বিচারের সারবত্তা যথার্থ উপলব্ধি করেছেন।'' (২০০৪৭)। রবীন্দ্রনাথ এই 'আর্যামি'র ধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন। 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি লিখেছেন

''ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াই আর্যগণের সহিত এখানকার আদিম অধিবাসীদের তুমুল বিরোধ বাধিয়াছিল। এই বিরোধে আর্যগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্যেরা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান বা আমেরিকান গণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্য উপনিবেশ হইতে বহিস্কৃত হইল না; তাহারা আত্মপনাদের আচার বিচারের সমস্ত পার্থক্য সত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের [সমাজব্যবস্থার] মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্য সমাজ বিচিত্র হইল।'' (রচনাবলী, ১৪০২ বাংলা, ২৬৩৮.)।

ভারতীয় ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ও সভ্যতা যে আর্য ও অনার্যদের মিশ্রণের ফল— রবীন্দ্রনাথ তা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। এবং এরই পাশাপাশি 'আর্য্যমি' সম্পর্কে শ্লেষের সুরে বলেছেন

''সেই প্রবল বেগবান সভ্যতাকে আজ আমরা নিতান্ত নিরীহ নির্বিরোধ নির্বিকার নিরাপদ নির্জীবভাবে কল্পনা করে নিয়ে বলছি, আমরা সেই সভ্যজাতি, আমরা সেই আধ্যাত্মিক আর্য, আমরা কেবল জপতপ করব, দলাদলি করব; সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করে, বিভিন্ন জাতিকে অস্পৃশ্য শ্রেণীভুক্ত করে, আমরা সেই মহৎ প্রাচীন হিন্দুনামের সার্থকতা সাধন করব।'' (রচনাবলী, ১৪০২ বাংলা ২৫০৭)।

মাত্র ২৭ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন—

মোক্ষমূলার বলেছে, 'আর্য'
সেই শুনে সব ছেড়েছি কার্য,
মোরা বলে করেছি ধার্য,
আরামে পড়েছি শুয়ে।
মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক
আমরাও তাই, করিয়াছি ঠিক,
এ যে নাহি বলে ধিক্ তারে ধিক্
শাপ দিই পইতে ছুঁয়ে।
বঙ্গবীর, ১৮৮৮।

'আর্য' সম্পর্কে উনিশ শতকীয় ভাবনাটি কিভাবে ভাষা থেকে জাতি ধারণায় পৌঁছলো এবং জাতীয়তাবাদের সাথে যুক্ত হয়ে কিভাবে একটি উন্মাদনা বা খ্যাপামিতে পরিণত হল তারই একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এখানে উপস্থিত করা হল। এবার দেখা হবে 'আর্য' সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতটি ঠিক কি ছিল।

(৩)

'আর্য খ্যপামির' জন্মদাতা ম্যাক্স মুলার সম্পর্কে বিবেকানন্দ বিরাট শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে বিবেকানন্দ ম্যাক্স মূলার সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে লিখেছেন, ''অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার একজন অসাধারণ ব্যক্তি। ... আমি তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে গিয়াছিলাম'' (২০১২১০১১৪)। '' ভারতের উপর তাঁহার কী অনুরাগ! যদি আমার সে অনুরাগের শতাংশের একাংশও থাকিত, তাহা হইলে আমি ধন্য হইতাম। এই অসাধারণ মনস্বী পঞ্চাশ বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া ভারতীয় চিন্তা রাজ্যে বাস ও বিচরণ করিয়াছেন, পরম আগ্রহ ও হৃদয়ের ভালবাসার সহিত সংস্কৃত সাহিত্যরূপ অনন্ত অরণ্যের আলো ও ছায়ার বিনিময় পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, শেষে ঐ সকল তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার সমগ্র সত্তায় উহার রঙ ধরাইয়া দিয়াছে'' (পূর্বোক্ত১১৫)। বিবেকানন্দ যদি এইটুকু বলে থামতেন তাহলেও তার একটা অর্থ দাঁড়াতো। ম্যাক্স মুলার বিবেকানন্দের গুরু রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে বই লিখেছেন। ম্যাক্স মুলারের বইটিই হল রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী সম্পর্কে কোন বিদেশীর লেখা প্রথম বই। স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকানন্দ যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বিবেকানন্দ নিজেই তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন ''... যে কোনো ব্যক্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসেন— তিনি নারীই হউন, পুরুষই হউন, তিনি যে কোন সম্প্রদায়-মত বা জাতিভুক্ত হউন না কেন— তাঁহাকে দর্শন করিতে যাওয়া আমি তীর্থযাত্রাতুল্য জ্ঞান করি।'' (পূর্বোক্ত১১৪)।

এই প্রবন্ধেই (ভারত বন্ধু অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার, ১৮৯৬) তিনি ম্যাক্স মূলারকে বেদান্তে বিশ্বাসী একজন হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাঁর ভাষায় ''ম্যাক্স মূলার একজন ঘোর বৈদান্তিক। তিনি বাস্তবিকই বেদান্ত-রূপ রাগিনীর নানা স্বর বিস্তারের ভিতর প্রধান সুরটিকে ধরিয়াছেন'' (পূর্বোক্ত১১৫)। ১৮৯৫-এর মে মাসে ম্যাক্স মূলার সম্পর্কে এতটা উচ্ছাস তাঁর ছিল না। কারণ সে সময়ে ম্যাক্স মূলার রামকৃষ্ণের উপর কোন বই বা প্রবন্ধ লেখেননি। তাছাড়া বিবেকানন্দর সাথেও

তাঁর তখনও ব্যক্তিগত পরিচয় হয় নি। তাই বিবেকানন্দ হেল ভগিনীগণকে চিঠিতে দ্বিধাহীনভাবে লিখতে পারেন ''অধ্যাপক ম্যাক্স মূলার তাঁর হিন্দু ধর্ম বিষয়ক রচনা সমূহের শেষভাগে ক্ষতিকর একটি মন্তব্য না দিয়ে ক্ষান্ত হন না'' (১৯৭৭৩২৯)। কয়েকমাসের মধ্যেই ম্যাক্স মূলারের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত আলাপ হওয়ায়, বিবেকানন্দ তাঁকে 'ঋষিকল্প লোক' বর্ণনা করেছেন (১৯৭৭৪৫৯)।

যাইহোক, এটা স্পষ্ট যে তিনি ম্যাক্স মূলারের রচনাবলী এবং মতের সাথে যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। এবং তিনি যে ম্যাক্স মূলারের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন, সেটা তাঁর ভাবনাটি আলোচনা করলেই বোঝা যায়। ম্যাক্স মূলারের আর্যভাষা ও জাতির সমীকরণ তিনি প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করলেও, স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গীতে প্রয়োজনের তাগিদে সে ধারণাকেও পরিত্যাগ করেছেন। নিজের মতো করে আর্য ধারনাটিকে গড়ে তোলেন। এ ধারণার পিছনে ভাষাতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্বের সমর্থন থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না।

ম্যাক্স মূলারের মতো বিবেকানন্দ আর্য ভাষা-গোষ্ঠীর মানুষকে জাতি হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। অতঃপর তিনি আরও চরম ও উগ্র সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর কাছে 'পৃথিবীর ইতিহাসের প্রাচীনতম জাতি হল আর্য। শুধু তাই নয়, এই আর্যরা হল 'ভারতীয় আর্য' (২০১২খ্ব ১০৬২)। বিবেকানন্দর এই মন্তব্য থেকে তিনটি বিষয় নিঃসৃত হয়

১) আর্য ভাষাগোষ্ঠী ও আর্য জাতির মধ্যে সমীকরণ করা হল।
২) ভারতীয় আর্য বলতে তিনি হিন্দুদের পূর্বপুরুষকেই বুঝিয়েছেন।
৩) ভারতীয় আর্যগণ (বা হিন্দুগণ) হলেন পৃথিবীর ইতিহাসে আবির্ভূত জাতি সমূহের মধ্যে প্রাচীনতম।

বিবেকানন্দ যে ম্যাক্স মূলারের ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আর্য ভাষা ও আর্য জাতির সমীকরণকে গ্রহণ করেছিলেন, সেই ম্যাক্স মূলারই ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে ভাষা ও জাতির মধ্যেকার সম্পর্ককে অস্বীকার করেন Auld Lang Syne (1898) নামক রচনায়। তিনি বলেন ''বৈজ্ঞানিক ভাষায় জাতি অর্থে আর্য শব্দের ব্যবহার অনুপযুক্ত। এই শব্দের অর্থ ভাষা এবং ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কিছুই হতে পারে না'' (থাপার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১১৪)। ম্যাক্স মূলার তাঁর পুরানো মত থেকে সরে এসেছিলেন খানিকটা বাধ্য হয়েই। কারণ তাঁর আর্য জাতির ধারণা ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও পন্ডিতদের দ্বারা প্রচন্ডভাবে সমালোচিত হয়েছিল। তাই উপায়ন্তর না দেখেই তাঁর এই পশ্চাৎ অপসারণ। বিবেকানন্দ কি ম্যাক্স মূলারের এই মত পরিবর্তন জানতেন না? জানাটাই স্বাভাবিক। কারণ ততদিনে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী হয়ে গেছে। ম্যাক্স মূলারের এই মত পরিবর্তন বিবেকানন্দকে সম্ভবত প্রভাবিত করতে পারেনি। কারণ তিনি আর্য জাতি সংক্রান্ত ধারণাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন একেবারে সিংহলীদের দেশে।

বিবেকানন্দের আর্য ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দুটি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা প্রয়োজন। প্রথমত, তাঁর মতের স্ববিরোধিতা। অর্থাৎ একই বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়ত, বিবেকানন্দের সমসময়ে এবং পরবর্তীকালের আর্য সংক্রান্ত গবেষণা তাঁর মতের সীমাবদ্ধতাগুলিকেই চিহ্নিত করে।

১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'পৃথিবীর ইতিহাসে আর্যদের প্রাচীনতম জাতি' (২০১২১০৬২) বলে চিহ্নিত করলেও, ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে 'তামিল জাতির' সভ্যতাকে সর্বপ্রাচীন বলে চিহ্নিত করেছেন। 'পরিব্রাজক'-এ লিখেছেন

''মান্দ্রাজ সেই 'তামিল' জাতির আবাস, যাদের সভ্যতা সর্বপ্রাচীন, যাদের 'সুমের' নামক শাখা 'ইউফ্রেটিস' তীরে প্রকান্ড সভ্যতা বিস্তার অতি প্রাচীনকালে করেছিল, যাদের জ্যোতিষ, ধর্মকথা, নীতি, আচার প্রভৃতি অসিরি বাবিলি সভ্যতার ভিত্তি, যাদের পুরাণ সংগ্রহ বাইবেলের মূল, যাদের আর এক শাখা মালাবার উপকূল হয়ে অদ্ভুত মিসরি সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল, যাদের কাছে আর্যরা অনেক বিষয় ঋণী'' (২০১২৬৬৭)।

এই 'পরিব্রাজক' (১৮৯৯)-এ তিনি আবার 'তামিল' শব্দের ব্যবহার না করে 'দ্রাবিড়ি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাদের নৃতাত্ত্বিক বর্ণনাও দিয়েছেন

''রঙ কালো, কিন্তু সোজা চুল, সোজা নাক, সোজা কালো চোখ— প্রাচীন মিসর, প্রাচীন বাবিলোনীয়ায় বাস করত এবং অধুনা ভারতময়— বিশেষ করে দক্ষিণ দেশে বাস করে; ইওরোপেও এক-আধ জায়গায় চিহ্ন পাওয়া যায়— এ এক জাতি। এদের পারিভাষিক নাম দ্রাবিড়ি'' (২০১২খ্ব ৬৮৭-৮৮)।

আর্যদের বর্ণনায় বলেছেন

''... যারা সংস্কৃতের সদৃশ ভাষা কয়, সোজা নাক মুখ চোখ, রঙ সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল, এদের নাম আরিয়ান'' (পূর্বোক্ত৮৮)।
এরপর তিনি যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা হল

''বর্তমান সমস্ত জাতিই এই সকল জাতির এই সকল জাতির [নেগ্রিটো, মোঙ্গালয়েড, দ্রাবিড়, সেমিটিক, আর্য ইত্যাদি] সংমিশ্রণে উৎপন্ন'' (পূর্বোক্ত)।

অর্থাৎ ১৮৯৭-এ বলা ''সমগ্র ভারত আর্যময়, এখানে অপর কোন জাতি নেই'' (২০১২৫খ্ব ১৪৫)— ধারণাকে তিনি পরিত্যাগ করলেন।

'পরিব্রাজক' (১৮৯৯)-এ তিনি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য করলেও 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে তা করেননি। তাঁর মতে আর্য ও দ্রাবিড়দের মধ্যে শুধুমাত্র ভাষাগত প্রভেদ আছে, নৃতাত্ত্বিক পার্থক্য নেই। তাঁর ভাষায়

''আর্য ও দ্রাবিড়— এই বিভাগ কেবল ভাষাতাত্ত্বিক বিভাগমাত্র, করোটি তত্ত্বগত (crani-

ological) বিভাগ নহে, সে ধরণের বিভাগের পক্ষে কোন দৃঢ় যুক্তিই নাই" (২০১২৫২৯৬)।

তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এই প্রবন্ধে বলেছেন

''ভাষাতাত্ত্বিক 'আর্য' ও 'তামিল' এই শব্দ দুইটির নিহিত তাৎপর্য যাহাই হউক না কেন, এমন কি যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ভারতীয়দের এই দুটি বিশিষ্ট শাখা ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্ত পার হইতে আসিয়াছিল, তবু অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বিভাগ ভাষাতত্ত্বগত— রক্তগত নহে" (পূর্বোক্ত)।

বিবেকানন্দের উত্থানে দক্ষিণ ভারতের ও তামিল জনগণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ফলে, তাদের প্রতি একটি কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর সবসময়ই কাজ করেছিল। 'কলকাতা জন্ম দিয়েছে বিবেকানন্দের, কিন্তু মাদ্রাজ আবিষ্কার করেছে তাঁকে'। (হিন্দু পত্রিকা। বসু, শঙ্করী, ২০০৯৫৩৪৮)।

অন্যান্য স্থানে তিনি তামিল / দ্রাবিড়দের পৃথক জাতি হিসাবে, আর্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাষা গোষ্ঠী হিসেবে দেখালেও দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে কখনই তিনি এই পার্থক্যকে স্বীকার করেননি। বরং তামিল / দ্রাবিড়দেরকে আর্য প্রতিপন্ন করারই চেষ্টা করেছেন। কে. সুন্দরম আয়ার তাঁর স্মৃতি কথায় জানিয়েছেন

''অধ্যাপক সুন্দরম পিল্লাইদের একটি মন্তব্যে স্বামীজী বিরক্ত হয়ে ছিলেন। অধ্যাপক বলেছিলেন— 'দ্রাবিড়' জাতির লোক হিসেবে তিনি নিজেকে হিন্দু সমাজের বহির্ভূত মনে করেন। পরে স্বামীজী বলেছিলেন, অধ্যাপক পিল্লাই পন্ডিত, যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু জাতি বর্ণের সংকীর্ণতার কাছে বিনা বিচারে তিনি নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছেন" (২০১২৬২)।

অর্থাৎ পিল্লাই-এর বক্তব্য তাঁর কাছে দুটি দিক থেকে আপত্তিকর— (১) দ্রাবিড়রা আর্য নয়, পৃথক জাতি এবং (২) দ্রাবিড়রা হিন্দু নয়। বিবেকানন্দের কাছে দ্রাবিড়রা আর্য এবং অবশ্যই হিন্দু। 'আর্য ও তামিল' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

''... আমাদের শাস্ত্রসমূহে 'আর্য' শব্দটি যে অর্থে দেখিতে পাই— যাহা দ্বারা এই বিপুল জনসঙ্ঘকে 'হিন্দু' নামে অভিহিত করা হয়– সেই অর্থটিই আমরা গ্রহণ করিতেছি। এ কথা সব হিন্দুর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য যে, এই আর্যজাতি সংস্কৃত ও তামিল এই দুই ভাষাগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত। কয়েকটি স্মৃতিতে যে শূদ্রদিগকে এই অভিধা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝায় যে, ঐ শূদ্রেরা এখনও নবাগত শিক্ষার্থী মাত্র, ভবিষ্যতে উহারাও আর্যজাতিতে পরিণত হইবে" (২০১২৫২৯৮)।

বিবেকানন্দের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বলা বক্তব্যের মধ্যে স্ববিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়েছেন বারংবার—

প্রথমত, কোথাও তিনি আর্যদের প্রাচীনতম জাতি (২০১২১০৬২) বললেও অন্যত্র তামিলদের প্রাচীনতম জাতি (২০১২৬৬৭) বলে অভিহিত করেছেন।

দ্বিতীয়ত, কখনও আর্য ও দ্রাবিড়দের একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীভুক্ত (২০১২৫২৯৬) বলে অভিহিত করলেও, অন্য স্থানে তাদের ভিন্ন নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কথা (২০১২৬৮৭-৮৮) বলেছেন।

তৃতীয়ত, ভারতবর্ষ আর্যময় (মিশ্রিত জাতি নয়) এখানে অন্য কোনো জাতি নেই বলে ঘোষণা করেও তিনি দেখিয়েছেন বর্তমানে কোনো জাতিই অবিমিশ্র জাতি নয় (২০১২৬৮৮) এবং আর্য জাতি 'সংস্কৃত ও তামিল' এই দুই ভাষাভাষীদের সমন্বয়ে গঠিত (২০১২৫২৯৮)।

চতুর্থত, তিনি আর্যদের হিন্দু বলে অভিহিত করেছেন, আবার একই সাথে 'আর্য' ও 'তামিল'দের মধ্যে ভিন্নতা দেখিয়েও তামিল/দ্রাবিড়দের হিন্দু বলে অভিহিত করতে চেয়েছেন। বিবেকানন্দের আর্য ফর্মূলাটি এইরকম—

আর্য = হিন্দু

হিন্দু = সংস্কৃতভাষী + তামিলভাষী

সুতরাং তামিলগণও আর্য জাতিভূক্ত।

তাঁর এ হেন সিদ্ধান্তটি অন্য একটি সিদ্ধান্ত থেকে নস্যাৎ হয়ে যায়। এটি হল ''দ্রাবিড়রা মধ্য-এশিয়ার এক অনার্য জাতি– আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল, আর দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রাই সব চেয়ে সভ্য ছিল" (২০১২৪২০১)। বিবেকানন্দের শেষ উদ্ধৃতি থেকে যা নিঃসৃত হল তা এইরকম—

প্রথমত, দ্রাবিড় শব্দটি তিনি জাতিবাচক অর্থে ব্যবহার করলেন, অর্থাৎ দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলেন।

দ্বিতীয়ত, দ্রাবিড়দের অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করলেন।

তৃতীয়ত, দ্রাবিড়দের বিদেশাগত হিসেবে দেখালেন।

চতুর্থত, দ্রাবিড়দের আর্যপূর্ব জাতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন।

তিনি শুধু তামিলদের নন, সিংহলীদের ও আর্য হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। ৩ জানুয়ারী, ১৮৯৭–তে মেরীকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন

''সিংহলীরা দ্রাবিড়জাতি নয়– খাঁটি আর্য। প্রায় ৮০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে বাংলাদেশ থেকে সিংহলে উপনিবেশ স্থাপিত হয় এবং সেইসময় থেকে তারা তাদের পরিস্কার ইতিহাস রেখেছে" (১৯৭৭৪্ম ৫২১)।

তিনি এমন সিদ্ধান্ত কিভাবে করলেন বা বোধগম্য হয় না। বিশেষ করে তাঁরই বর্ণনা থেকে আর্যদের যে ছবি আমরা পাই তা সিংহলীদের সাথে একেবারেই মেলে না। অর্থাৎ তাঁরা সংস্কৃত সদৃশ ভাষায় কথা বলে না, তাদের সোজা নাক মুখ চোখ, গায়ের রং সাদা, চুল কালো বা কটা, চোখ কালো বা নীল (২০১২৬৮৮) নয়।

(৪)

বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে আর্য কাকে বলে, আর্যরা কারা, তারা কোথা থেকে এলো তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ইত্যাদি প্রশ্নের যদি উত্তর খুঁজতে হয় তাহলে সরাসরি তাঁর রচনাবলীর সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় তাঁর ধারণাটি ঠিক কি ছিল তা বোঝা যাবে না।

আত্মানুসন্ধানে রত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতই বিবেকানন্দ আর্য্যামিকে আত্মপরিচয়ের সাথে

যুক্ত করেছিলেন। বাঙালী সহ সমগ্র ভারতবাসীকে আর্য হিসেবে দেখে একধরনের জাতিগত কৌলিন্যের দাবি জানিয়েছিলেন। এবং তা প্রকাশও করেছিলেন আমেরিকায় সাদা চামড়াদের সামনে। উৎস যেহেতু আর্যজাতি তাই আমেরিকা বা ইউরোপের সাদা চামড়ার প্রভূদের থেকে ভারতবাসী কিছু কম নয়— এই ধরনের ছদ্ম জাতীয়তাবাদী গরিমা তাঁকে গ্রাস করেছিল। তাই তিনি নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেন যে আমেরিকার সাদা চামড়ার অধিবাসী ও ভারতের কালো মানুষেরা একই বংশোদ্ভুত আর্যবংশোদ্ভুত। ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৪-এ বলেন, ''... আমরা [আমেরিকার শ্বেতকায় ও ভারতীয় হিন্দুরা] সকলেই একটি সাধারণ সূত্র— আর্যজাতি হইতে উদ্ভুত হইয়াছি'' (২০১২খ্ব ১০১৯)। ১৭ ডিসেম্বর, ১৮৯৪-এ আমেরিকায় অন্য একটি ভাষণে বলেন যে, আমেরিকাবাসী এবং হিন্দুরা একই আর্যজাতির বংশধর। (Burke 2006:2:406)।

নিজেদের অর্থাৎ ভারতীয় হিন্দুদের ভারতীয় হিন্দুদের আর্য বলার ক্ষেত্রে তিনি কারণ নির্দেশ করেছেন। এবং তা করতে গিয়ে একটি সংজ্ঞায় উপনীত হয়েছেন "We call ourselves the Aryan race" (Burke, 2006:2:417)। অর্থাৎ আমরা নিজেদেরকে আর্যজাতি বলে ডাকি। তাই আমরা আর্য। এই আর্যকে উত্তরে বিবেকানন্দ যা বলেন তার সাথে ভাষাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব বা প্রত্নতত্ত্বের কোন যোগই নেই। তাঁর উত্তরটি হল "He is a man whose birth is through religion. This is a piculiar subject, perhaps, in this country, but the idea is that a man must be born through religion, through prayers" (Burke. 2006:2:417)। বাংলা করলে দাঁড়াবে, আর্য হল সেই মানুষ যে ধর্মের মধ্যে দিয়ে, প্রার্থনার মধ্য দিয়ে জন্মায়। এই বক্তৃতাতেই তিনি বলেছেন যে, একটি শিশুর বস্তুগত জন্মের মধ্যে দিয়ে আর্য হয় না, আর্যকে জন্মাতে হয় আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে (পূর্বোক্ত)। বিবেকানন্দের সমসাময়িক চিন্তাবিদ্‌গণও এ ধরণের আর্য ধারণাকে সমর্থন করেন নি। পরবর্তী পর্বের ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিকগণও আর্য কে বা কারা এ প্রশ্নের উত্তরে এই ধরনের অসম্ভব সংজ্ঞাকে কখনই প্রশ্রয় দেন নি।

তিনি তিনটি সভ্যতা সহ প্রায় সব সভ্যতার একটি জাতিগত উৎসের কথা বলেছেন— তা হল আর্য জাতি। এই তিনটি সভ্যতা হল— রোমান, গ্রীক ও হিন্দু সভ্যতা (পূর্বোক্ত৪২০)। এই আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায়? এরা কি বাইরে থেকে ভারতে এসেছিল না ভারতবর্ষই তাদের আদি বাসভূমি? এই সব প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দের বক্তব্য চূড়ান্ত রকমের স্ববিরোধী ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে তিনি 'ভারতে ভূমির প্রথম বিজেতা' হিসেবে আর্যগণকে চিহ্নিত (২০১২খ্ব ১০৪৬৪) করেই থামেননি, তাদের উদারতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করে দেখান যে আর্যরা ''দেশের [ভারতের] তৎকালীন অধিবাসীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই'' (পূর্বোক্ত)। ''উত্তর ভারতের অধিবাসী আর্যেরা দক্ষিণাঞ্চলের অনার্যগণের উপর নিজেদের আচার-ব্যবহার জোর করিয়া চাপাইবার চেষ্টা করেন নাই, তবে অনার্যেরা আর্যদের অনেক রীতিনীতি ধীরে ধীরে নিজেরাই গ্রহণ করে'' (পূর্বোক্ত)। আর্যরা যে বহিরাগত সে কথার সমর্থন পাওয়া যায় তাঁর অন্যান্য বক্তব্যেও। যেমন—

''আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ন সমতলভূমিতে আর্যগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাঁটি ব্রাহ্মণজাতি বিদ্যমান''। (২০১২১০২৯)।

''আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া ভারতের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় অবিরাম কর্ম করিতে সমর্থ হইল না; সুতরাং তাহারা চিন্তাশীল ও অন্তর্মুখ হইয়া ধর্মের উন্নতি সাধন করিল'' (পূর্বোক্ত১২৮)।

''দ্রাবিড়ীরা মধ্য এশিয়ার এক অনার্য জাতি। আর্যদের পূর্বেই তারা ভারতে এসেছিল...'' (২০১২৪২০১)।

''প্রাচীন নথিপত্র অনুসারে আর্যদের বাসভূমি ছিল তুর্কীস্থান, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম তিব্বতের মধ্যবর্তী দেশে'' (২০১২৫২৮৮)।

বিবেকানন্দের বক্তব্য থেকে এ পর্যন্ত যা দেখা গেল তা হচ্ছে, দ্রাবিড়দের মত আর্যরাও বহিরাগত, বিদেশী এবং ভারতে বসবাসকারী আর্যরা হলেন হিন্দু (২০১২৫২৯৮)। এই হিন্দুদেরই আবার তিনি মূল ভারতবাসী বলে চিহ্নিত করেছেন ইংল্যান্ডে প্রদত্ত একটি ভাষণে, ৭ মে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে। (Vivekananda. 2008:vol IX:249. The Complete Works.)। এই বক্তৃতায় এমন সিদ্ধান্ত শুরুতে করলেও পরবর্তী অংশে আর্য সংক্রান্ত একটি ভাষা ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনার উত্থাপন করে এমন সিদ্ধান্তে এসেছেন যাতে করে শ্রোতা ও পাঠকের হতভম্ব হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

জোন্স, ম্যাক্স মূলার ও জার্মান ভাষাতাত্ত্বিকদের আলোচনার উল্লেখ করে তিনি দেখিয়েছেন যে সংস্কৃত ও সকল ইউরোপীয় ভাষাগুলির মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রাচীন ভাষাগুলির মধ্যে গ্রীক ভাষার সাথে সাদৃশ্য খুবই বেশি। এর পরেই আসে লিথুনিয়ান ভাষার কথা। যার সাথে সংস্কৃতের তাৎপর্যপূর্ণ মিল রয়েছে। এর মধ্য থেকে যে তত্ত্বটি গড়ে ওঠে তা হল প্রাচীনকালে একটি জাতি ছিল, যে জাতির সদস্যরা নিজেদের আর্য বলে অভিহিত করত। এদেরই ভাষা ছিল সংস্কৃত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী এই আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়। এই জাতি পরবর্তীকালে বহু শাখায় বিভক্ত হয়ে ইউরোপ, পারস্য প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের নিজস্ব ভাষাও গড়ে ওঠে একই সাথে। বিবেকানন্দ এই তত্ত্ব উত্থাপনের পর স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে এ মত এখনও প্রমাণিত হয়নি। কারণ এ তত্ত্ব বহু ক্ষেত্রেই সমস্যাকীর্ণ। যেমন, এই তত্ত্ব যদি সঠিক হয় তাহলে ভারতের মানুষেরা কালো এবং ইউরোপীয়ানরা সাদা হয় কি করে? এই ধরনের বহু সমস্যাই অমীমাংসিত রয়ে গেছে (পূর্বোক্ত২৫০–৫১)। তিনি কিন্তু দুটি বিষয়ে নিশ্চিত তা হল—

প্রথমত, ইউরোপ ও উত্তর ভারতের মানুষেরা যে ভাষায় কথা বলে তা একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা (পূর্বোক্ত২৫১)।

দ্বিতীয়ত, আর্যভাষাগুলির মধ্যে সর্বপ্রাচীন হল সংস্কৃত ভাষা। আর্যজাতির যে প্রশাখা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো তারাই প্রথম সভ্যতা স্থাপন করেছিল এবং প্রথম গ্রন্থ ও সাহিত্য রচনা করেছিল (পূর্বোক্ত)। তাঁর আন্দাজ অনুযায়ী এই সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্যের সূচনা হয়েছিল ৮০০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দে (পূর্বোক্ত)।

বর্তমান প্রবন্ধে তিনি আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। প্রথমটি

হল, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয়রা আর্য নয়। তাদের সভ্যতা ইউরোপীয়দের থেকেও প্রাচীন। যদিও কোন কোন দিক থেকে মিশরীয়রা আর্যদের সমকালীন ছিল। পদ্ম, বাঁদর এবং চন্দন গাছের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে ভারতীয় আর্যদের সাথে তিনি মিশরীয় সভ্যতার সাদৃশ্য খোঁজার চেষ্টা করেছেন (পূর্বোক্ত২৫২)। এর পরেই তিনি মিশরীয়দের আর্যদের তুলনায় খুবই প্রাচীন বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু একই সাথে দেখান যে, তারা হিন্দুদের থেকে প্রাচীন নন (...the Egyptions-- were much older than the Aryans, except the Hindus.) (পূর্বোক্ত)।

জীবনের শেষ পর্বে তিনি লিখেছিলেন 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' (১৩০৬-০৮ বাংলা)। এখানে কিন্তু এই আর্যদের বিদেশ থেকে আসার ধারণাটিকে তিনি পুরোপুরি ত্যাগ করেছেন। ইউরোপীয় পন্ডিতদের আর্যতত্ত্বের সমালোচনা করে বলেছেন যে, ''আর্যরা কোথা হতে উড়ে এসে ভারতের 'বুনোদের' মেরে-কেটে জমি ছিনিয়ে বাস করলেন— ওসব আহাম্মকের কথা। আমাদের পন্ডিতরাও দেখছি সে গোঁয়ে গোঁ— আবার ঐ সব বিরূপ মিথ্যা ছেলেপুলেদের শোনানো হচ্ছে। এ অতি অন্যায়" (২০১২৬১৬৩)। ''কোন বেদে কোন সূক্তে, কোথায় দেখছ যে, আর্যরা কোন বিদেশ থেকে এদেশে এসেছে? কোথায় পাচ্ছ যে, তাঁরা বুনোদের মেরে-কেটে ফেলেছেন? খামকা আহাম্মকির দরকারটা কি?" (পূর্বোক্ত১৬৪)।

বিবেকানন্দের এই ধারণা ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে মাদ্রাজে 'ভারতের ভবিষ্যৎ' নামক ভাষণে আরও বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে তিনি বলেন

''প্রত্নতাত্ত্বিকগণ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন যে, ভারত কৃষ্ণচক্ষু আদিম জাতিসমূহে পরিপূর্ণ ছিল— উজ্জ্বলবর্ণ আর্যগণ আসিয়া সেখানে বাস করিলেন; তাঁহারা কোথা হইতে যে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিলেন, তাহা ঈশ্বরই জানেন! কাহারও কাহারও মতে মধ্য-তিব্বত হইতে, আবার কেহ কেহ বলেন মধ্য এশিয়া হইতে। অনেক স্বদেশ-প্রেমিক ইংরেজ আছেন, যাঁহারা মনে করেন— আর্যগণ সকলেই হিরণ্যকেশ ছিলেন। অপরে আবার নিজ নিজ পছন্দমত তাঁহাদিগকে কৃষ্ণকেশ বলিয়া স্থির করেন। লেখকের নিজের চুল কালো হইলে তিনি আর্যগণকেও কৃষ্ণকেশ করিয়া বসেন। আর্যগণ সুইজারল্যান্ডের হ্রদগুলির তীরে বাস করিতেন— সম্প্রতি এরূপ প্রমাণ করিবারও চেষ্টা হইয়াছে। তাঁহারা সকলে মিলিয়া যদি এই সব মতামতের সঙ্গে সেখানেই ডুবিয়া মরিতেন, তাহা হইলেও আমি দুঃখিত হইতাম না! আজকাল কেহ কেহ বলেন, আর্যগণ উত্তরমেরু নিবাসী ছিলেন। আর্যগণ ও তাঁহাদের বাসভূমির উপর ভগবানের আশীর্বাদ বর্ষিত হইক। আমাদের শাস্ত্রে এই সকল বিষয়ের কোন প্রমাণ আছে কিনা যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে দেখিতে পাইবে— আমাদের শাস্ত্রে ইহার সমর্থক কোন বাক্য নাই; এমন কোন বাক্য নাই, যাহাতে আর্যগণকে ভারতের বাহিরে কোন স্থানের অধিবাসী মনে করা যাইতে পারে; আর আফগানিস্থান প্রাচীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শূদ্রজাতি যে সকলেই অনার্য এবং তাহারা যে বহুসংখ্যক ছিল, এ-সব কথাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সে সময়ে সামান্য কয়েকজন উপনিবেশকারী আর্যের পক্ষে শত সহস্র অনার্যের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া বাস করাই অসম্ভব হইত। উহারা পাঁচ মিনিটে আর্যদের চাটনির মতো খাইয়া ফেলিত (২০১২৫১৪৬)।

আর্য সংক্রান্ত যে ধারণা বিবেকানন্দের বাণী, রচনা ও চিঠিপত্রে পাওয়া যায় তার উপর ভিত্তি করে পাঠকের পক্ষে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। তাহলে আর্যপ্রশ্ন সম্পর্কে বিবেকানন্দের মতটি ঠিক কি ছিল? নাকি তাঁর কোন মতই নেই। বস্তুত আর্য সংক্রান্ত বিষয়ে যে গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন ছিল এবং তার জন্য যে সময় দেওয়া দরকার ছিল তার কোনোটাই বিবেকানন্দের ছিলনা। আরও দুটি সমস্যা এখানে যুক্ত ছিল প্রথমটি হল— সমসাময়িক কালের ঔপনিবেশিক ক্ষমতা-কাঠামোর স্বার্থরক্ষাকারী ভাষাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের ক্ষতিকর মতবাদ ও চিন্তা ভাবনার প্রবল প্রভাব, এবং দ্বিতীয়ত, প্রাগার্য সভ্যতা হিসেবে হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব তখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত থাকা।

(৫)

বিবেকানন্দ বিশেষজ্ঞ শঙ্করীপ্রসাদ বসু (২০০৯) আর্য ও তামিল প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বক্তব্য আলোচনা করতে গিয়ে একদেশদর্শীভাবে দেখিয়েছেন যে, বিবেকানন্দের মতে আর্যরা বহিরাগত নয়, আর্য ও তামিলরা সদৃশ ইত্যাদি। একই সাথে এও বলেছেন যে, ''তাঁর [বিবেকানন্দের] যুক্তির অংশ কতদূর গ্রাহ্য তা ঐতিহাসিক-প্রত্নতাত্ত্বিক-নৃতাত্ত্বিকগণ বিচার করবেন" (২০০৯৫৩৫৪)। আধুনিক কালের আর্য সংক্রান্ত যে গবেষণা সে সম্পর্কে শঙ্করীবাবু যথেষ্ট সচেতন হওয়া সত্ত্বেও, সযত্নে সে প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন। হয়তো এই কারণেই যে, আর্য সংক্রান্ত আধুনিক গবেষণাগুলি আর যাই হোক বিবেকানন্দের আর্য ধারণাকে কখনই সমর্থন করবে না। এবং সেই কারণে সে আলোচনা থেকে শঙ্করীবাবু নিজেকে দূরে রেখেছেন। এই প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলিও তাঁর নজর এড়িয়েছে। তাই তিনি এক্ষেত্রে তাঁর পছন্দ মত উদ্ধৃতিগুলিকেই লেখায় স্থান দিয়েছেন এবং ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিকদের হাতে বিবেকানন্দের আর্য ধারণা সম্পর্কিত বিচারের ভার ছেড়ে দিতে চেয়ে ভারমুক্ত হতে চেয়েছেন।

এখন এটা দেখার বিষয় হল আর্য ধারণা সম্পর্কে আধুনিক গবেষণালব্ধ জ্ঞানটি কি? জোন্স ও ম্যাক্স মুলারের প্রভাবিত বিবেকানন্দ আর্যকে জাতি হিসেবে দেখালেও জোন্স 'আর্য' শব্দটিকে জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহার করেন নি। ম্যাক্স মূলার প্রথম দিকে আর্য ভাষার সাথে জাতি ধারণার যোগাযোগ ঘটালেও— পরবর্তী সময়ে এ ধারণার বিরুদ্ধে আপত্তি উঠতে থাকে ফলে তিনি তাঁর মত প্রবর্তন করেন। অর্থাৎ ভাষা এক হলেও জাতিও যে এক হবে এর কোন মানে নেই। ম্যাক্স মূলারের আর্য ভাষা-জাতি সমীকরণের বিরুদ্ধ মত প্রবল হয়ে উঠলে, তিনি একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাঁর পুরানো মত প্রত্যাহার করে নেন এবং বলেন যে, আমি আর্য অর্থে একটা মনুষ্যজাতিকে বুঝি না, একটা ভাষাকেই বুঝি (ভৌমিক, সুহৃদকুমার কর্তৃক উদ্ধৃত ২০১০১৭)।

বিবেকানন্দের যাত্রা ছিল বিপরীত মুখী। জোন্স একটি আদি ভাষার কথা বলেছিলেন, তার বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংস্কৃতকে অন্যতম হিসেবে দেখেছিলেন। ম্যাক্স মূলার আর্য ভাষা থেকে শুরু করে জাতি ধারণায় পৌঁছিয়ে ছিলেন। বিবেকানন্দের শুরু কিন্তু আর্যজাতি থেকে। তার থেকে তিনি আর্যভাষা বা সংস্কৃত ভাষায় পৌঁছান। এবং শেষে গভীর বিশ্বাসের সাথে আর্যজাতি ধারণার সাথে হিন্দুত্বকে মিশিয়ে দেন। ম্যাক্স মূলার পরবর্তীকালে যে নিজের মতের পরিবর্তন করেছিলেন, বিবেকানন্দ ভুলেও কিন্তু তা একবারও উচ্চারণ করেন নি। শঙ্করীবাবুর পরামর্শমত আধুনিক কালের গবেষকরা আর্য ধারণাকে যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা যদি আলোচনা করা হয় তাহলে বিবেকানন্দের বক্তব্যটির মূল্য নিরুপন করা সম্ভব হবে।

বর্তমান পর্বে দুটি বিষয় নিয়ে কথা হবে— ১. সিন্ধু সভ্যতা ও ২. আর্য সভ্যতা। এখানে দেখার চেষ্টা করা হবে যে অনার্য সভ্যতা হিসেবে সিন্ধু সভ্যতার চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল। ভারতীয় সভ্যতার গঠনে সেই উপাদানগুলি যে এখন প্রবলভাবে বর্তমান— তারও একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ এখানে উত্থাপিত হবে। দ্বিতীয় অংশে আর্য ভাষা-ভাষী মানুষের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল, আর্য শব্দের অর্থগুলি কি কি এবং তারা বহিরাগত না ভারতীয়— ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হবে।

সিন্ধু সভ্যতা

উনিশ শতকের (এবং বিশ শতকের প্রথম দিকের) 'আর্যামী' উন্মাদনা বেশ কিছু পরিমাণে প্রশ্নের সামনে এসে পড়ে সিন্ধু সভ্যতার (বা হরপ্পা সভ্যতার) আবিস্কারের (১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দে) ফলে। বিবেকানন্দের জীবদ্দশাতে এ আবিষ্কার ঘটলে তাঁর মতটা কি দাঁড়াত তা খানিকটা আন্দাজ করা গেলেও যে সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। কারণ সে মন্তব্য হয়ে পড়বে খানিকটা অন্ধকারের দিকে ঝাঁপ। বরং এটা দেখার চেষ্টা করা যেতে পারে যে, সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার কোন কোন প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসলো, কিভাবে ভারতের ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করলো এবং 'আর্য্যামী' নামক উন্মাদনাকে বাধা দিল।

সিন্ধু সভ্যতা ছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলির সবচেয়ে বিস্তৃত ও ব্যাপক। ভারত, আঙ্গ ফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের আধুনিক রাষ্ট্রগুলিতে অবস্থিত সিন্ধ, মাক্রান, বালুচিস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর রাজস্থান, কাথিয়াবাড়, কচ্ছ এবং বাদাথশানে সিন্ধু বা হরপ্পা সভ্যতার অসংখ্য এলাকা আবিস্কৃত হয়েছে। ১৯২২-২৩ খ্রিষ্টাব্দকে সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের কাল বলে চিহ্নিত করা হলেও এই সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছিল এরও প্রায় একশ বছর আগে। ১৮২৬ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ চার্লস ম্যাসন পশ্চিম পাঞ্জাবের প্রাক্তন মন্ট গোমারি এবং বর্তমান সাহিওয়াল জেলার হরপ্পায় এর প্রথম নিদর্শন আবিষ্কার করেন। তিনি এই স্থানটিকে কোন দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে আলেকজান্ডার বার্নস স্থানটি পরিদর্শন করেন। তিনিও ম্যাসনের মতই মনে করেছিলেন এটা কোন দুর্গনগরীর ধ্বংসাবশেষ। কিন্তু দুজনের মধ্যে কেউই স্থানটির সুপ্রাচীনত্ব সম্পর্কে কোন ধারণা দিতে পারেননি। এখানে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য শুরু হয় ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে। নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম। কানিংহাম এই অঞ্চলে ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার খননকার্য চালান। উৎখননের মধ্য দিয়ে তিনি যে নিদর্শনগুলি পেয়েছিলেন তার উপর একটি বিবরণ তৈরী করেন, যা প্রকাশিত হয় ১৮৭২-৭৩ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রতিবেদনে।

এর ৫০ বছর পর ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানী সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলার মহেঞ্জদারো ও হরপ্পা নামক প্রত্নস্থল দুটি আবিষ্কার করেন। তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন স্যার জন মার্শাল। এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য চলে ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দ অবধি। এর পরেও বহুস্থানে এই খননকার্য চলে এবং এই গবেষণার মধ্য দিয়ে আবিষ্কার হয় প্রাগার্য সিন্ধু সভ্যতার— যার ভৌগলিক বিস্তৃতি ছিল ৫০০০০০ বর্গমাইল (চক্রবর্তী, রণবীর। ২০০৭৪৯)। এই উৎখননের ধারাতেই আবিষ্কৃত হয়ে পড়ে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতাটি— মেহেরগড় সভ্যতা।

মানবেতিহাস পর্যালোচনায় তিনটি প্রস্তরযুগের সন্ধান যাওয়া যায়— আদি, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগ। নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষির উন্মেষ ভারতীয় উপমহাদেশে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করলো। বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত মেহেরগড় প্রত্নস্থল এই নতুন পরিস্থিতির সাক্ষ বহন করে। ১৯৭৮ খ্রিষ্টাব্দে মেহেরগড় খননকার্যের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রাঁসোয়া জারিজের নেতৃত্বে আর. আলাচিন, আর. মিডো, এল. কনস্টানটিনি, এম. লেচ্চিভেলিয়ার, জি.এল. পসীল প্রমূখ বিজ্ঞানীগণ মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মেহেরগড় প্রাচীনতম পর্বের কাল নির্দিষ্ট হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সময়সীমায়। এই পর্বে কৃষির বিকাশের পাশাপাশি পশুপালনও শুরু হতে দেখা যায়। পাথরের অস্ত্রের সন্ধানও মেলে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে উপমহাদেশের আদিমতম শস্যভান্ডার নির্মাণ এই সময়েই ঘটে। মেহের গড়ের দ্বিতীয় পর্বে (৫০০০ খ্রিঃপূঃ থেকে ৪০০০ খ্রিঃপূঃ) তলাবস্ত্র ও বীজ তৈল নিস্কাশনের মতো ঘটনাটি ঘটে। আর্বিভাব ঘটে কাস্তের, অলঙ্কার শিল্পের এবং কুমোরের চাকের। মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্বে (৪৩০০ খ্রিঃপূঃ—৩৮০০ খ্রিঃপূঃ) কুমোরের চাকের ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়ে যায়। এবং পাত্রগুলি ছিল চুল্লীতে পোড়ানো। পাত্রের গায়ে অলংকার ও নক্সার বৃদ্ধি ঘটে। তামার ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। শুরু হয় নামমুদ্রা বা সীলমোহরের প্রচলন। এগুলি প্রশাসনিক ও ব্যবসা-বানিজ্যের কাজেই মুখ্যত লাগে। অর্থাৎ এই পর্বে এসে সাদামাটা গ্রামীন কৃষি প্রধান জীবনের থেকেও জটিলতর সমাজব্যবস্থার আর্বিভাব ঘটেছিল। মেহেরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে পাওয়া অসংখ্য কঙ্কালের দাঁতগুলির গভীর অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, ভারতবর্ষের এই 'আদি কৃষকদের' সঙ্গে পশ্চিম এশিয়ার মানুষদের চেয়ে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার, জনসমষ্টির বেশি সাদৃশ্য ছিল (হাবিব ২০০৮৫৮)। তৃতীয় পর্বে যে শিল্পের নিদর্শন মেলে সেগুলিতে অনার্য প্রভাবই লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাদের সমাধীগুলির নিদর্শন এখানে উল্লেখ্য (পূর্বোক্ত৬৪)। এটি ছিল প্রাক-হরপ্পাযুগের সমাজ-সংস্কৃতি (চক্রবর্তী, রণবীর,২০০৭ প্রথমখন্ড৪৫-৪৬)। হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল এই মেহেরগড় সভ্যতাই। অন্য ভাষায় মেহেরগড় সভ্যতার ধারাবাহিক বিকাশের ফলই ছিল হরপ্পা সভ্যতা।

হরপ্পা সভ্যতার সময়কালটি হল খ্রিঃপূঃ ৩০০০ থেকে ১৭০০ খ্রিঃপূঃ পর্যন্ত। সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া মানুষের কঙ্কাল ও করোটি পরীক্ষা করে চারটি ভিন্ন জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। জনগোষ্ঠীগুলি হল প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড, মেডিটোরেনিয়ান, মোঙ্গোলয়েড ও আল্পো-দিনারিক। প্রোটো-অষ্ট্রালয়েড বলতে সাধারণত কোল ও মুন্ডাদের বোঝায়। এরাই সংস্কৃত সাহিত্যের নিষাদ। দ্রাবিড়রাই মেডিটোরেনিয়ান। গোন্ড, কুই এবং ওঁরাওগণ এদের মধ্যে পড়েন। যাদের দেহগঠন চিনাদের মতো তারাই মোঙ্গোলয়েড। আল্পো-দিনারিকগণও অনার্য। যে সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো সহ সিন্ধু সভ্যতার অন্যান্য স্থানে পাওয়া গেছে সেখান থেকেও এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, এই সভ্যতা ছিল একটি প্রাগার্য সভ্যতা (দ্রষ্টব্য রত্নাগর ২০০৩ হাবিব ২০০৪, সুর ১৯৯৫, কোশাম্বি ১৯৫৬,১৯৭২)।

অতুল সুরের (১৯৯৫) আলোচনা থেকে পাওয়া যায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল পুরোপুরি একটি প্রাগার্য সভ্যতা। শুধু তাই নয় তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে, ''হিন্দু সভ্যতার গঠনের মূলে বারো আনা ভাগ

হচ্ছে প্রাগার্য উপাদান, আর মাত্র চার আনা ভাগ আর্য সভ্যতার আবরণে মন্ডিত (সুর, ১৯৯৮১২)।

বস্তুত পক্ষে সিন্ধু সভ্যতার সাথে আর্য সভ্যতার কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে—

প্রথমত, সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীরা ছিলেন শিশ্ন-উপাসক ও মাতৃ-উপাসক। কিন্তু আর্যদের দেবতারা মূলত পুরুষ।

দ্বিতীয়ত, সিন্ধু সভ্যতায় ঘোড়ার কোন কঙ্কাল পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে আর্যদের কাছে ঘোড়াই ছিল শ্রেষ্ঠ জন্তু।

তৃতীয়ত, সিন্ধুবাসীরা ছিলেন নগরবাসী। আর্যরা নগর নির্মাণ করতে জানতেন না। বরং তারা নগর ধ্বংস করতেন। সেই কারণেই ইন্দ্রকে 'পুরন্দর' (নগর/বাঁধ ধ্বংসকারী) হিসেবে অভিহিত করা হত।

চতুর্থত, সিন্ধু সভ্যতায় মৃতদের সমাধীস্থ করা হত। কিন্তু আর্যরা মৃত ব্যক্তিকে দাহ করতেন।

পঞ্চমত, সিন্ধুবাসীরা ভাষার লিখিতরূপ ছিল। কিন্তু আর্যদের তা ছিল না। তাই ওরা বেদকে মুখস্থ করতো। বেদকে বলা হত 'স্মৃতি' ও 'শ্রুতি'।

ষষ্ঠত, সিন্ধুসভ্যতা ছিল কৃষিভিত্তিক। কিন্তু আর্যরা ছিলেন যাযাবর পশুপালক।

সপ্তমত, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকেও উভয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল।

অতুল সুরের (১৯৯৫)-র মতে, ''সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা এক উন্নত বৈষয়িক সভ্যতার ধারক ছিল। অপরপক্ষে আর্যরা ছিল বর্বরজাতি" (১৯৯৫৮৫)।

আর্যপ্রশ্ন

এবারে আসা যাক আর্য প্রশ্ন নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণার ফলগুলি সম্পর্কে। বিবেকানন্দের শ্রদ্ধেয় ভাষাবিদ্ ম্যাক্স মূলার এবং উনিশ শতকের রমেশ দত্ত আর্যদের বহিরাগত হিসাবেই চিহ্নিত করেছিলেন। গোটা বিশ শতক জুড়ে আর্য সংক্রান্ত গবেষণার মধ্যে দিয়ে যা বেরিয়ে এসেছে, তা বিবেকানন্দের মতের পক্ষে স্বস্তিদায়ক নয়। শুধু তাই নয় বিশেষজ্ঞদের মতামত বৈদিক আর্যগরিমার ধারণাটিকে প্রায় পুরোপুরিই বাতিল করে দেয়। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার যেমন দেখায় ভারতে বৈদিক আর্য সভ্যতার থেকেও বহু প্রাচীন মেহেরগড় ও হরপ্পা সভ্যতা এদেশে ছিল, তেমনি আর্য সংক্রান্ত গবেষণা দেখায় যে ভারতবর্ষ কখনই বিবেকানন্দ কথিত 'আর্যময়' নয়। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রোমিলা থাপারের পর্যবেক্ষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ

''ভারতে যদি কোন সময় বিশুদ্ধ আর্য জাতি থেকেও থাকে, তা হলে তাদের 'বিশুদ্ধতা' বেশিদিন টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। এমন কোন জাতি যে বর্তমান যুগ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে, একথা আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়। বিজ্ঞানসম্মত জীববিদ্যা আজ আর একথা স্বীকার করে না যে, কোন 'বিশুদ্ধ' জাতি অপরিবর্তিতভাবে টিকে থাকতে পারে— ইতিহাসে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রনের ফলে জাতিগত 'বিশুদ্ধতা' ক্রমেই হ্রাস পায়" (১৯৮৫২৯)।

ফলে বিবেকানন্দ যখন বলেন, ''আকাশচুম্বী হিমালয় পর্বতমালার পাদদেশে বিস্তীর্ণ সমতলভূমিতে আর্যগণ আসিয়া বসবাস করেন। এখনও পর্যন্ত ভারতে তাঁহাদের বংশধর খাঁটি ব্রাহ্মণ জাতি বিদ্যমান" (২০১২১০২৯)। সেই ধারণা অর্থহীন ধারণায় পরিণত হয়। বস্তুতপক্ষে এই ধরণের আজগুবি ধারণা উনিশ শতকের প্রধান চিন্তাবিদ্দের রচনাতেও পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই খাঁটি আর্যতত্ত্ব ও ব্রাহ্মণতত্ত্বের ধারণাটি।

'আর্য' শব্দটির অর্থ

'আর্য' শব্দটি অধিকাংশ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় না পাওয়া গেলেও কয়েকটিতে যাওয়া যায়। দুটি প্রাচীন গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ' ও 'আবেস্তা'-তে 'আর্য' শব্দটির ব্যবহার আছে। 'আর্য' শব্দকেন্দ্রিক সব যুক্তিতর্ক বিচার করে ও. জেমেরেনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে, এই শব্দটি ইন্দো-ইউরোপীয় নয়, নিকট প্রাচ্যের, সম্ভবত উগরির মত ভাষা থেকে গৃহীত শব্দ, যার অর্থ হল 'আত্মীয়' অথবা 'সঙ্গী'। হিট্টাইট ভাষায়ও 'আর্য' শব্দটির অর্থ 'আত্মীয়' বা 'বন্ধু'। আবার 'ইরান' শব্দটি 'আর্য' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত (শর্মা, রামশরণ ১৯৯৭১০)। অধ্যাপক শর্মার মনে হয়েছে, ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় 'আর্য' শব্দটির অর্থ 'প্রভু' বা 'অভিজাত' শ্রেণীর ব্যক্তি হলেও, সব ক্ষেত্রেই 'আর্য' শব্দটি এই অর্থ বহন করতো না। ফিনিক্সিয় ভাষায় 'ওরজ'শব্দটির অর্থ 'দাস'।[১] এই 'ওরজ' শব্দটির উৎপন্ন হয়েছে 'আর্য' শব্দ থেকে (পূর্বোক্ত)।

ঋগ্বেদে ইন্দ্র উপাসকদের আর্য বলা হত। যখন এই গ্রন্থে একদিকে আর্য আর অন্যদিকে দাস ও দস্যুদের মধ্যে যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে, তখন প্রথমোক্তদের স্বদেশী ও দ্বিতীয়কে বিদেশী বিবেচনা করা হয় নি। এই যুদ্ধ হয়েছে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে— ব্রতপালনকারী ও ব্রত পালনকারী নয় (অব্রত বা অন্যব্রত) এমন মানব গোষ্ঠীদের মধ্যে। সে সময়ে ভারতকে একদেশ বা জাতির দৃষ্টিতে দেখা হয় নি (শর্মা, ১৯৯৭১০)।

গায়ের রঙের (বর্ণের) ভিত্তিতে ঋগ্বেদে কতকগুলি সূক্তে আর্যদের একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীরূপে দেখানো হয়েছে। আর্যদের শত্রুদের কালো (কৃষ্ণবর্ণ) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আর্যদের বলা হয়েছে মানুষী প্রজা, যারা অগ্নি-বৈশ্বানরের পূজা করত এবং কখনও কখনও কৃষ্ণবর্ণ মানুষদের গৃহে গৃহে আগুন জ্বালিয়ে দিত। কথিত আছে, আর্যদেবতা সোম কৃষ্ণবর্ণ লোকেদের হত্যা করতেন। এও বলা হয়েছে, তিনি কৃষ্ণবর্ণ রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন এবং ৫০,০০০ 'কৃষ্ণ' (বর্ণ)কে নিহত করেছিলেন। বিশ্বাস করা হয়, তিনি অসুরের কৃষ্ণচর্ম অপসারিত করেছিলেন। ঋগ্বেদে 'আর্য' শব্দের সব উল্লেখ জাতি বা বর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায় না। মূল 'অর' থেকে নিষ্পন্ন এই শব্দটির অর্থ হল 'পাওয়া'। আবেস্তায় 'আর্য' শব্দের অর্থ প্রভু অথবা অভিজাতকুলের ব্যক্তি, এবং এই অর্থে ঋগ্বেদের কতকগুলি উল্লেখের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (শর্মা ১৯৯৭১১)।

ঋগ্বেদে জাতিগত দিক থেকে কয়েকটি মিশ্র গোষ্ঠী দেখা যায়। দশজন রাজা বা বিশপতি বিখ

১. ফিনল্যান্ডবাসী তাদের প্রতিবেশী ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যদের পদানত করেছিল, তখন তারা নিজেদের ভাষায় 'ওরজ' শব্দটি দাসকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করতো (শর্মা, রামশরণ, ১৯৯৭১০)।

ত্যাত 'দশ রাজার যুদ্ধে' অংশ নিয়েছিলেন। নামের তালিকা থেকে জানা যায়, প্রত্যেকে যুযুধান পক্ষে আর্য ও অনার্য, উভয়ই ছিল। পরে, যাঁরা সম্মানিত ও উচ্চপর্যায়ভুক্ত অথবা অভিজাত কুলোদ্ভূত, তাঁরা আর্য নামে পরিচিত হন। পরবর্তী বৈদিক ও বৈদিকোত্তর কালে 'আর্য' শব্দটির দ্বারা উচ্চতর তিনবর্ণকে বোঝাত, যাঁদের 'দ্বিজ' নামেওঅভিহিত করা হয়। শূদ্রদের কখনই আর্যদের পর্যায়ভুক্ত করা হয়নি। আর্যদের স্বাধীন বলে মনে করা হত। অপরদিকে, শূদ্ররা স্বাধীন ছিল না (শর্মা ১৯৯৭১১)।

আর্য → আর্যত্বম বা আর্যভাব
↓
শূদ্র
↓
দাস

আর্যপ্রাণ শূদ্রকে দাস পর্যায়ে অধঃপতিত করা যেত না—

আর্যত্বম— এক নাগরিক স্বাধীনতাকে বোঝাত। যে শূদ্রদের পিতা-মাতা আর্য তাঁরা স্বাধীন বলে গণ্য হতেন। গুপ্তযুগ পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা বেশি ছিল না, পাবর্তীকালে তাঁরা সংখ্যাধিক্যতা অর্জন করলে, ব্রাহ্মণসহ উচ্চতর শ্রেণী তাদের অনার্য বিবেচনা করত।

'আর্য' শব্দটি তাই কখনই জাতিবাচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়নি। এটা একটা ভাষাবাচক শব্দ মাত্র। ঐতিহাসিক ডি.ডি. কোশাম্বীও এই মতই প্রকাশ করে বলেছেন যে, 'আর্য' শব্দটিকে 'জাতি' অর্থে ব্যবহার করলে তা হাস্যকর হয়ে দাঁড়াবে। প্রকৃতপক্ষে তারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো এবং নিজেদের 'আর্য' বলে অভিহিত করতো। এখানে নৃতত্ত্বগত সাদৃশ্য ছিল না। অতুল সুরের পর্যবেক্ষণটিও সদৃশ ''আর্য ভাষাভাষী জাতিগণের মধ্যে কোনরূপ নৃতাত্ত্বিক ও আবয়বিক সাদৃশ্য ছিল না'' (সুর, ১৯৯৮১০)।

আর্যদের ভারতে আগমন

হিন্দুত্ববাদীদের বাদ দিলে বর্তমানে প্রায় সকল ঐতিহাসিকগণই একথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে আর্যরা বহিরাগত। অতুল সুর সুস্পষ্টভাবেই আর্যদের বহিরাগত হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কোশাম্বীর মতটিও অনুরূপ (Kosambi, ১৯৭২৭৬)। পার্সিভাল স্পীয়ারও আর্যদের বহিরাগত ও আক্রমণকারী হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এদের একটি শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে ১৫০০ খ্রিঃপূঃ প্রবেশ করে (Spear 1961:31)। রুশ ঐতিহাসিকগণ দেখিয়েছেন, আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায় বা দক্ষিণ রাশিয়ার স্তেপভূমিতে (আন্তোনভা, বোনগার্দ-লেভিন-কতোভস্কি ১৯৮৬৪১)। আরও অনেকে এই ধারাতেই মত প্রকাশ করে কয়েকটি যুক্তি উত্থাপন করেছেন—

১. আর্যদের আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ– এই মতের সপক্ষে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায় না। বরং এরই বিপরীতে আর্যদের ভারতে আগমনের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। রামশরণ শর্মা (২০০৩) এই প্রত্নস্থলগুলিকে নির্দেশ করেছেন। তিনি বলেছেন

''উপমহাদেশে আর্যদের আগমনের পর্যায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উত্তর বালুচিস্তানে ঝোব নদীর পারে পেরিয়ানো ঘুন্ডাই, বোলান গিরিপথের কাছে পিরাক, গোমস উপত্যকায় গোমাল গিরিপথের কাছে গুমলা এবং অন্যান্য কবরস্থান এবং সোয়াত উপত্যকায় গান্ধার কবরক্ষেত্র" (২০০৩৪১)।

২. আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিবেকানন্দের বক্তব্য ছিল আর্যদের সভ্যতা আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার (২০১২৪১৮৯)। এবং আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ সমপরিমাণ প্রাচীন। যদিও অন্যত্র তিনি তাকে আরও প্রাচীন বলতে চেয়েছেন। কিন্তু কোথাও আবার বেদকে সৃষ্টির সন-তারিখ নির্নীত হতে পারে বলে তিনি মনেই করেন না। তাঁর মতে বেদ অনাদি-অনন্ত (বিবেকানন্দ ২০১২৫১১)। আধুনিক ঐতিহাসিকরা কিন্তু বেদের যে কাল নির্ণয় করেছেন তা বিবেকানন্দের থেকে ভিন্ন। তাদের মতে, ঋগ্বেদ খ্রিষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ১০০০-এর মধ্যে রচিত (হাবিব ও ঠাকুর ২০০৬২)।

৩. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর ভৌগলিক অবস্থান ভারতবর্ষ যে আর্যদের আদিবাসস্থান তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়। বিবেকানন্দের কাছে এসব সাক্ষ্য-টাক্ষ্য সব 'আহাম্মকের কথা' (২০১২ঞ্জ ৬১৬৩)।

৪. আর্যদের ঘোড়ার ও লোহার ব্যবহার সিন্ধুবাসীদের জানা ছিল না। ঘোড়া, লোহার অস্ত্র এবং রথ প্রাগার্য সভ্যতাকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিল।

৫. বিবেকানন্দের মতে, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে কেবল আসেনি, তারা এদেশীয় বুনোদের মেরে কেটে জমি ছিনিয়ে নিয়ে বাস করতে শুরু করে— এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা (২০১২৬ঞ্জ ১৬৩)। বেদেও এমন ধরনের কথা কোথাও নেই যে আর্যরা বুনোদের মেরে কেটে ধ্বংস করেছে (পূর্বোক্ত ১৬৪)। এর বিপরীতে অতুল সুর বেদ থেকে উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, আর্যরা ছিল যোদ্ধার জাত। সিন্ধু সভ্যতার বণিকদের ঐশ্বর্য ও ধনদৌলত তাদের ঈর্ষান্বিত করেছিল। তাই তারা সিন্ধু সভ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়েছিল। নগর ধ্বংসকারী ইন্দ্রকে তাই বেদে পুরন্দর বলা হয়েছে (সুর ১৯৯৫৮৯-৯০ এবং ১৯৯৮১৬)। অর্থাৎ বিবেকানন্দ কথিত 'আর্যেরা অতি দয়াল ছিলেন' (২০১২৬১৬৪)। তা বোধহয় খুব একটা সত্য নয়।

(৭)

বিবেকানন্দ ছিলেন উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজে গড়ে ওঠা ভ্রান্ত আর্যভাবনা তথা হিন্দুভাবনার এক সার্থক প্রতিনিধি। তাৎক্ষণিকতা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার ফলে যখন যেমন তথ্য পেয়েছেন তখন সে রকমই সিদ্ধান্ত করেছেন। ফলে তার ভাবনাচিন্তাটি হয়ে পড়েছে স্ববিরোধিতার এক অনন্য উদাহরণ। কিন্তু এক গোঁ থেকে তিনি কখনই সরে আসেননি তা হল 'ভারত আর্যময়, এখানে আর কোন জাতি নেই'' আধুনিক কালে গবেষণা কিন্তু প্রমাণ করেছে এইরকম অবিমিশ্র জাতি সম্ভব নয়। তাঁর ভাবনার দ্বিতীয় সমস্যা হল তিনি ভাষা ও জাতিকে সমার্থক হিসেবে গ্রহণ

করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ভারতের বহু বিচিত্র ও বহুধাবিভক্ত সমাজকে একটি ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তাই তার কাছে জাতি সমস্যার সমাধান ছিল আর্যজাতির ধারণা। তা যে নিদারুণভাবে বর্ণব্যবস্থা ও বৈষম্যমূলক সমাজের সংরক্ষণেই কাজ করে তা কি তিনি বুঝেছিলেন?

গ্রন্থপঞ্জী

আন্তোনেভা, কো., বোন্‌গাদ-লেভিন, গ্রি., কতোভ্‌স্কি, গ্রি. ১৯৮৬। *ভারতবর্ষের ইতিহাস*। মস্কোপ্রগতি প্রকাশন।

আয়ার, কে, সুন্দররম। ২০১২। *স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ*। স্বামীজীর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গুণগাহিগণ। ২০১২। স্মৃতির আলোয় বিবেকানন্দ। ভাষান্তর স্বরাজ মজুমদার ও মিতা মজুমদার। কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয়।

গঙ্গোপাধ্যায়, দিলীপকুমার। ২০০০। *ভারত ইতিহাসের সন্ধান*। কলকাতাসাহিত্যলোক।

চক্রবর্তী, রণবীর। ২০০৭। *ভারত-ইতিহাসের আদিপর্ব। প্রথম খন্ড*। কলকাতাওরিয়েন্টাল লংম্যান।

চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সুনীতিকুমার। ২০০৪। *সাংস্কৃতিকী*। খন্ড। কলকাতাআনন্দ।

জোন্স, উইলিয়াম। ২০১১। *এশিয়ামানব ও প্রকৃতি*। অনুবাদ– অমিতা চক্রবর্তী। কলকাতাদি এশিয়াটিক সোসাইটি।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ১৪০২ বাংলা। *রবীন্দ্র রচনাবলী*। খন্ড ২, ৬, কলিকাতাবিশ্বভারতী। প্রবন্ধস্বদেশী সমাজ।

থাপার, রোমিলা। ১৯৮৫। *পূর্বকাল ও পূর্বধারণা*। অনুবাদ– ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়। নয়াদিল্লি ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।

থাপার, রোমিলা, কোনোয়ার, দেশপান্ডে, রত্নাগর। ২০১১। *ভারতবর্ষঐতিহাসিক সুচনা ও আর্যধারনা*। অনুবাদ– আবীরা বসু চক্রবর্তী। নয়াদিল্লিন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট ইন্ডিয়া।

দত্ত, রমেশচন্দ্র। ২০০১। *প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতার ইতিহাস*। কলকাতাদীপায়ন।

দেশপান্ডে। ২০১১। হাবিব, ইরফান। ২০০৪। *সিন্ধুসভ্যতা*। ভাষান্তর– কাবেরী বসু। কলকাতাএন.বি.এ. প্রাঃলিঃ।

বসু, শঙ্করীপ্রসাদ। ২০০৯। *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*। পঞ্চমখন্ড। কলকাতামন্ডল বুক হাউস।

বিবেকানন্দ, স্বামী। ১৯৭৭। *পত্রাবলী*। কলিকাতাউদ্বোধন ।

বিবেকানন্দ, স্বামী। ২০১২। *বাণী ও রচনা*। কলকাতাউদ্বোধন। দশখন্ডে সম্পূর্ণ।

ভৌমিক, সুহৃদকুমার। ২০১০। *আর্যরহস্য*। কলকাতামনফকিরা।

রত্নাগর, শিরিন। ২০০৩। *হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে*। ভাষান্তর– কাবেরী বসু। কলকাতাঙ্গ এন.বি.এ. প্রাঃলিঃ।

শর্মা, রামশরণ। ১৯৯৭। আর্যদের অনুসন্ধান। অনুবাদ– ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা প্রগে এসিভ পাবলিসার্স।

শর্মা, রামশরণ। ২০০৩। *আর্যদের ভারতে আগমন*। অনুবাদ–গৌতম নিয়োগী। কলকাতাঙ্গ ওরিয়েন্টাল লংম্যান।

সুর, ড. অতুল। ১৯৯৫। *সিন্ধুসভ্যতার স্বরূপ ও সমস্যা*। কলিকাতাউজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির।

সুর, ড. অতুল। ১৯৯৮। *হিন্দু সভ্যতার নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য*। কলকাতাসাহিত্যলোক।

সেন, সুকোমল। ২০০০। *ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্ম শ্রেণী ও জাতিভেদ*। কলকাতান্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

হাবিব, ইরফান; ঠাকুর, বিজয় কুমার। ২০০৬। *বৈদিক সভ্যতা*। ভাষান্তর– কাবেরী বসু। কলকাতাএন.বি.এ. প্রাঃলিঃ।

হাবিব, ইরফান। ২০০৮। *প্রাক-ইতিহাস*। ভাষান্তর– কাবেরী বসু। কলকাতাএন.বি.এ. প্রাঃলিঃ।

The Complete Works of Swami Vivekananda. 2008. Vol- IX. Kolkata : Advaita Ashrama.

Burke, Marie Louise. 2006. Vol-2. Swami Vivekananda in the west : New Discoveries- His Prophetic Misssion, Part two. Kolkata : Advaita Ashrama.

Kosambi, D.D. 1956. An Introduction to the study of Indian History. Bombay : Popular Book Depot.

Kosambi, D.D. 1972. The Culture and Civilisation of Ancient India. New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

Muller, Max. 1862, 1883, 1888. রোমিলা থাপার (২০১১) কর্তৃক ব্যবহৃত ও উদ্ধৃত।

Spear, Persial. 1961. India- A Modern History. The University of Michigan Press, USA.

‘শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত’ এক ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক প্রয়াস ঃ প্রসঙ্গ হরিচাঁদ ঠাকুর-এর নিষেধাজ্ঞা

দুলালকৃষ্ণ বিশ্বাস

প্রাক্‌কথন

বৈদিক যুগোত্তর কাল থেকে, বিশেষ করে পুষ্যমিত্রের সময় থেকে, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি, ভারতে আর্থ-সামাজিক অগ্রগমন ও তৎসংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক বিকাশকে স্থবিরতায় বেঁধে রেখেছিল। এদেশের সমাজ-ইতিহাসের এই স্থবিরতার কারণ সম্ভবত শিক্ষার থেকে শ্রমের বিচ্ছিন্নতা। মানুষের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ার উন্নয়নের স্বার্থে এদেশের জ্ঞানচর্চা প্রযুক্ত হয়নি, তা সীমিত থেকেছে নানা দার্শনিক ভাবনাতে মাত্র। অপর পক্ষে শ্রম থেকে শিক্ষা বিচ্ছিন্ন থাকায় শ্রমজাত অভিজ্ঞতা দ্বারাও জ্ঞানচর্চা প্রভাবিত হয়নি। বলা যায়, শ্রমের সংগে শিক্ষার সার্বিক বিচ্ছিন্নতা এদেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশকে স্থবিরতায় বদ্ধ করেছে। উৎপাদনের সংগে সম্পর্কহীন এদেশের জ্ঞানচর্চার অধিকারী মানুষের অর্থাৎ, ব্রাহ্মণদের জ্ঞানচর্চায় জড়জগতের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অনুপস্থিত থেকেছে। অপরদিকে, শ্রমজীবী মানুষকে শিক্ষার অধিকার বঞ্চিত করায় তারা তাদের শ্রমার্জিত জ্ঞানকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশে নিয়োগ করতে পারেন নি। এজন্যই এদেশের উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ যেমন থেমে ছিল বৈদিক যুগে, তেমনি থেমেছিল এদেশের সমাজ বিকাশের ইতিহাসও। এরই সংগে সমাজজীবনে মানুষকে বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থায় স্থায়ীভাবে বিভাজিত করায় সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল অনুপস্থিত, যে সংগ্রাম ব্যতীত উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটেনা, বিকাশ ঘটে না মানুষের মানবিক সম্পর্কের এবং অতঃপর ঘটে না সামাজিক অগ্রগমন।

এমন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র যে শ্রমজীবী মানুষকে এক অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য করেছে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ ও তার রাষ্ট্র তাই নয়, শ্রমজীবী মানুষকে অমানবিক জীবনযাপনে বাধ্য করতে গিয়ে এই সমাজের সুবিধাভোগীরা নিজেদেরও উন্নততর জীবনযাপন থেকে বঞ্চিত করেছেন এবং সর্বোপরি, ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে অন্তর্ঘাত ঘটিয়েছেন।

শ্রমজীবীদের চির ‘দৈব-দাসত্বের’ এই দেশে তাঁদের মুক্তির পথ-প্রদর্শক মানুষও তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ উঠে আসেন নি। কেননা, এদেশের শ্রমজীবীরা ধর্মের নামে এই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রকে মেনে নেওয়ায় নিজেদের শিক্ষা-সংস্কৃতি থেকে যেমন বঞ্চিত রাখতে বাধ্য হয়েছেন, তেমনি তাঁরা রাষ্ট্রীয় সমাজ থেকেও (from civil society) মুখ ফিরিয়ে থেকেছেন। ফলে তাঁরা পাননি তাঁদের মুক্তির দার্শনিক পথ নির্দেশ। অপরদিকে দেশের মানুষের সমর্থনহীন রাষ্ট্র বারবার বহিরাক্রমণে পরাস্ত হয়েছে। এরই উত্তরাধিকার অদ্যাবধি বাহিত হওয়ায় তথাকথিত গণতন্ত্রের এই দেশে সাধারণ মানুষ রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে সাধারণভাবে একাত্ম বোধ করেন না। রাষ্ট্রীয় সমাজের মানুষও সাধারণ জনদের আপনজন ভাবেন না।

প্রথম পরিবর্তন

ইংরেজরা এদেশে আসার পর ভারত সমাজের স্থবিরতায় প্রথম গতি সঞ্চার ঘটে। ইউরোপীয় উৎপাদন ব্যবস্থা তথা উৎপাদিকা শক্তির আগমনে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের স্থায়ী পেশাভিত্তিক জাতব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত ব্রাহ্মণ ঐ ব্রহ্মার পা থেকে উৎপন্ন শূদ্রের সঙ্গে যবন ইংরেজের পদাশ্রিত হতে কাল বিলম্ব করেন নি। এ-দেশে যখন ইউরোপীয় কলকারখানা গড়ে উঠল তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ল অল্প শিক্ষিত শ্রমিকের যা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগী শ্রমকাতর একমুঠো মানুষ দিয়ে মেটানো সম্ভব ছিল না। অতঃপর বৃটিশের আনা উৎপাদিকা শক্তির ধাক্কাজাত আঙ্খ লোড়ন এদেশের চিরায়ত শ্রমজীবী তথা মনুর শূদ্রদের নিকটও পৌঁছে যায়। কিন্তু বৃটিশ পুঁজির তরফে এদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের উপর নির্ভরশীলতা হেতু তাদের আনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সুফল তৎক্ষণাৎ চিরায়ত শ্রমজীবীদের নিকট পৌঁছাতে পারে না। অবশ্য ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের বিদেশী যবনাশ্রয় ঐ তন্ত্রের চির-নিপীড়িতের মনেও প্রশ্ন উত্থাপন করে। তাই শাস্ত্রের বুলি দিয়ে নিপীড়িত জাতের মানুষদের আর তাদের জাত পেশায় আটকে রাখাও সম্ভব ছিল না।

ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কোন বিধি-নিষেধ নমো জনগোষ্ঠীর উপর কখনই কার্যকরী ছিল না। আর এজন্যই এই জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সমসাময়িক উৎপাদন ব্যবস্থার সর্বপ্রকার কার্যে অংশ নিতেন; তথাকথিত জাত-পেশা বলে এই জনগোষ্ঠীর কোন নির্দিষ্ট পেশা ছিল না। কিন্তু তারা রাষ্ট্রীয় সমাজ বহির্ভূত জীবনযাবন করতে বাধ্য হওয়ায় সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পিছিয়ে পড়েছিলেন। অপরদিকে বরং নমো জনগোষ্ঠীর ধনিক শ্রেণীর লোকেরা তাঁদের শ্রেণী অবস্থান বজায় রাখতে ও শক্তিশালী করতে, অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জায় রাখতে বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রাশ্রিত সেন রাজাদের সহযোগী হিসেবে শামিল হন, অবশ্যই তাঁদের জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার বহন করে। এঁরাই হন বাংলার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভিত্তিশক্তি এবং অবশ্যই ব্রাহ্মণ। পরবর্তীকালে যারা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে শামিল হন তাঁরা ঐ তন্ত্রের ধারা অনুসরণ করে নানা ‘জাত’ পরিচয় গ্রহণ করেন বা ‘ক্রয়’ করেন। এঁদের মধ্যে কেবল ব্রাহ্মণেরাই গয়াতে পান্ডাদের নিকট নমোদের সমমর্যাদা পান ও পিতৃস্মৃতিতে পিন্ডদান করতে পারেন। অন্যজাতের হিন্দুরা যদি ভাতের পিন্ডদান করতে চান তবে পান্ডাদের নিকট তাঁদের নমোজনগোষ্ঠীতে মূল বংশ-পরিচয় জ্ঞাপন করতে হয়। কারণ, পান্ডাদের পুঁথিতে কেবল ঐসব বংশ তালিকা লিপিবদ্ধ আছে।’ অন্যথায় তারা চাল-কলার পিন্ডদান করতে পারেন।

ইংরেজ এদেশে তাদের পার্লামেন্টে পাশ করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত করলে নমোজনগোষ্ঠীও তার আওতায় আসে এবং পাল আমলের পর আবার তাঁদের রাষ্ট্রীয় সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আসলে বৃটিশ কর্তৃক ইউরোপীয় ধাঁচের এক সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ জমিদারি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এদেশের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রাধীন শ্রমজীবী জাতগুলি রাষ্ট্রের প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থার অধীন আসতে বাধ্য হয়। এরই ফলশ্রুতিতে প্রায় হাজার বৎসর রাষ্ট্রীয় সমাজ-বহির্ভূত নমো জনগোষ্ঠীরও রাষ্ট্রের সঙ্গে পুনঃরায় সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

এই পরিবর্তনের আর্থ-ভিত্তি, অর্থাৎ ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আমদানি শুরু হয় এদেশে উনিশ শতকের প্রথম দশকের শেষে। ঠিক এই সময়ে নমো জনগোষ্ঠীতে জন্ম হয় ঐ গোষ্ঠীর আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের, যাঁর পিতৃদত্ত নাম হলো হরিদাস বিশ্বাস। তাঁর জন্মের (১৮১২) চল্লিশ বৎসর পূর্বে জন্ম হয় রাজা রামমোহন রায়ের এবং ব্যক্তি নয়,

দার্শনিক রামমোহনের জন্মের পটভূমিকাও রচিত হয়েছিল ইংরেজের আনা আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে। আর এজন্যই রামমোহনের সংস্কার আন্দোলন এদেশীয় রাষ্ট্রীয় সমাজের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সুবিধাভোগীদের এক ক্ষুদ্র অংশের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ ছিল। কেননা, এই ইউরোপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল কেবলমাত্র এই সুবিধাভোগীদের এক নগণ্য অংশের মানুষের। অপরদিকে, দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় তখনও কোন মৌলিক পরিবর্তন না ঘটায় উৎপাদক তথা শ্রমজীবী শ্রেণীর মানুষেরা তাদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়ায় ইংরেজ আগমনের কোন অভিঘাত অনুভব করার সুযোগ তখনও পাননি। কিন্তু ইতিমধ্যে ইংরেজদের বাণিজ্য ভবনে এবং তাদের প্রশাসনিক কাজে কেবল ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীরাই তাঁদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়াকে (Organic living process) প্রসারিত করার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। (এটাই ছিল ভারতে ইংরেজ আগমনকে 'ঈশ্বরের আশীর্বাদ' ভাবনার উৎস।) কেননা, এতাবৎকাল তাঁরাই বহন করেছেন এদেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশগ্রহণের ঐতিহ্য। এই ঐতিহ্যের অনুসরণে সাফল্য পেতে ইংরেজের প্রশাসনিক সংস্কৃতিকেও তাঁরা গ্রহণ করেছেন, অবশ্যই তাঁদের একটা ক্ষুদ্র অংশের তরফে। কেননা, তাঁদের সমগ্রকে আত্মস্থ করার পরিমাণগত সীমাবদ্ধতা ছিল ইংরেজের ব্যবসা-বাণিজ্যিক প্রশাসনে। এই সংস্কৃতি চর্চাকে কেন্দ্র করেই তাঁদের মনে পশ্চাদপদ ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মানুষ হিসেবে যে হীনমন্যতার জন্ম হয়; তার থেকে মুক্ত হতে তাঁদের কিছুটা সাহায্য করে রামমোহনের ব্রাহ্ম-ধর্মান্দোলন। আর তাই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগী আলোকপ্রাপ্তরা রামমোহনের দার্শনিক ভাবনা গ্রহণ করে এক নতুন আপাত প্রগতিশীল অবস্থানে থাকার তৃপ্তি বোধ করতে থাকেন। অবশ্য এঁদেরই অপর এক অংশ ইউরোপীয় ধর্ম-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতেও দ্বিধা করেন নি। এই উভয় অংশের মানুষদের বাইরে যে আলোকপ্রাপ্তরা ছিলেন, তাঁরা চিরায়ত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সীমানাকে দৃশ্যত না অতিক্রম করলেও একটা যুক্তিবাদী অবস্থান থেকে কিন্তু সমাজ-সংস্কারকের ভূমিকাও পালন করেছেন। এঁরাই হলেন আধুনিক বাঙালি মধ্যবিত্তের সাংস্কৃতিক পূর্বসুরি।

ইউরোপীয় আলোকপ্রাপ্ত মানুষদের এই আর্থ-সমাজ (অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থাজাত সমাজ) ভিত্তিহীন শিল্প-সাহিত্যান্দোলন তাই ভারতীয় ঐতিহ্য পরিহার করে ও ইউরোপীয় সাংস্কৃতিক ভাবধারাকে অনুসরণ করে এবং তারই ফলে বাংলা ও ভারতীয় মনীষা বিশ্ব-সভ্যতার অঙ্গনে স্থান করে নেওয়ার সুযোগ পায়। অথচ, তাঁদেরই স্বদেশে কুৎসিত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের জগদ্দল পাথরের নিচে অমানবিক জীবনে বাঁধা পড়ে থাকেন তাঁদেরই সমাজের শ্রমজীবী অংশের মানুষ। এমনকী, ইংরেজ আগমনের ফলে যে ছিটেফোঁটা আলোড়ন শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী নানাজাতের জনগোষ্ঠীর নিকট পৌঁছায় তা ইউরোপের অনুরূপ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থাজাত সংস্কৃতি ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে না আসায় তাঁদের সামাজিক মুক্তি আন্দোলন প্রচেষ্টা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের পশ্চাদপদ্ কানাগলির গোলক ধাঁধায় আত্মসমর্পণ করে। বস্তুত কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিপীড়নে বিধ্বস্ত নমো জনগোষ্ঠীর মুক্তির দিশারি মহান হরিচাঁদ ঠাকুরের যে জীবনচরিত রচনা করেছেন, তাতে এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীরা এমনকী তাঁদের সর্বাধুনিক ধর্মগুরু, প্রথাগত শিক্ষাবর্জিত শ্রী গদাধর চট্টোপাধ্যায় অর্থাৎ 'শ্রী রামকৃষ্ণের' জীবনচরিত রচনা করতেও চিরায়ত ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতি পরিহার করেছেন। (অর্থাৎ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি রচনাতে যেমন অবাস্তব কল্পকাহিনী ও তথাকথিত শী ক্ষমতার নানা গাল-গল্পের ব্যবহার করা হয় তেমন কৌশল প্রায় বর্জন করেছেন) সেখানে শ্রী হরিচাঁদের মত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী সংগ্রামী মানুষ, যিনি আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসম্পন্ন গণআন্দোলনকে এদেশে সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছিলেন তাঁর নিজ জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও নিপীড়ন বন্ধ করার দাবিতে, সেই মহান এক ঐতিহাসিক চরিত্রকে কবিয়াল শ্রী সরকার উপস্থাপিতকরলেন মধ্য বা প্রাক্-মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী কবিদের অবিবেচনা প্রসূত অনুকরণের দ্বারা। এই ভ্রান্ত অনুকৃতিদ্বারা রচিত শ্রী হরিচাঁদের সংগ্রামী জীবন বাংলার ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ব্যবস্থার নিপীড়িতদের মুক্তির যে বাস্তবসম্মত ও মানবিক জীবনানুগ পথ প্রদর্শন করেছিল, সে পথকে অনুসরণ করতে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ব্যর্থ হলেন। (মনে রাখতে হবে, ভারতের তথাকথিত মহান ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক সমাজ সেই বৈদিক যুগ থেকে প্রায় একই অবস্থানে অবরুদ্ধ ছিল উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত।) তাঁরা মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ভাবধারার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে থাকলেন এবং অপরদিকে, এই বিভ্রান্ত মানুষদের ভাবাবেগকে মূলধন করে এই মহান মানুষটির উত্তর পুরুষেরা ও তাঁর অনুরাগী (অনুগামী নন) গোঁসাইরা ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সর্বাধিক সুবিধাভোগী ব্রাহ্মণদের মতই ধর্ম ব্যবসায় নিজেদের নিয়োগ করলেন। (ঠাকুর নগরের বারুণির মেলায় বর্তমান ঠাকুর বংশের লোকেরা প্রতিবৎসর তাঁদের স্বজনগোষ্ঠীর ভাবাবেগকে মূলধন করে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রণামি উপার্জন করেন যার একটি পয়সাও ঐজন গোষ্ঠীর লোকেদের পার্থিব জীবনোপযোগী সংগ্রামে উপযুক্ত করার কাজে ব্যয়িত হয় না। অবশ্য এই উত্তরপুরুষদের সঙ্গে শ্রী হরিচাঁদের সুযোগ্যপুত্র আর এক মহান নেতা গুরুচাঁদকে এক করলে তা হবে ইতিহাসের এক বিকৃত মূল্যায়ণ। শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর যথাযথই তাঁর সময়কালকে বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাই শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে তাঁর জীবিতকালেই শ্রী তারক সরকার রচিত শ্রী হরিচাঁদের এই তথাকথিত জীবনী 'শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত' প্রকাশিত হয়, যে জীবনী গ্রন্থ সম্পর্কে স্বয়ং হরিচাঁদেরই আপত্তি ছিল।

এই গ্রন্থ প্রকাশনায় যে স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুরেরই আপত্তি ছিল, সেকথা আমরা অবগত হই ঐ গ্রন্থেরই ভূমিকা লেখক কবিয়াল তারক সরকারেরই অন্যতম শিষ্য শ্রী হরিবর সরকারের নিকট থেকে। তাঁর বয়ানেই শোনা যাক, কী বা কেমন ছিল সেই নিষেধাজ্ঞা

''মহাপ্রভুর লীলার প্রারম্ভে, প্রথমত প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস ও দশরথ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়, প্রভুর লীলা প্রকাশ মানসে, শ্রীযুক্ত কবি রসরাজ তারক সরকার মহাশয়কে লেখক পদে নিযুক্ত করিয়া অত্র লীলা কতকাংশে লিখিয়া, শ্রীধাম ওড়াকান্দি গিয়া, মহাপ্রভুকে শুনাইয়াছিলেন। তখন মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখতে নিষেধ করেন'' (ভূমিকা, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৭)।

এই পুস্তক রচনার বিরুদ্ধে হরিচাঁদ ঠাকুরের আপত্তি এতটাই তীব্র ছিল যে মৃত্যুঞ্জয়কে ''তখন মহাপ্রভু বলিলেন, মৃত্যুঞ্জয়, তুমি যদি এই লীলাগ্রন্থ প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার কুষ্ঠ হইবে, এবং হস্ত-পদাদির অঙ্গুলী স্খলিত হইবে'' (প্রাগুক্ত)।

অপরদিকে মৃত্যুঞ্জয় এই অভিশাপকে সাদরে গ্রহণ করেন

''সেত আমারজীবনের লীলাগীতি লেখার পরম পুরস্কার এবং কর্ম্মজগতে মানবদেহের অতিমূ

ল্যবান আভরণ, অতএব আমি লীলাগীতি লিখিব" (ঐ)।

খুব স্বাভাবিক কারণে দুটি প্রশ্ন উঠে আসে এক ঠাকুর হরিচাঁদ কেন লীলাগ্রন্থ প্রকাশ করার বিরোধিতা করেন? এবং দুই, গোস্বামী মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস কেনই বা তাঁদের ''স্বয়ং পূর্ণব্রহ্মের'' নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ? এবং অতিরিক্ত আরো একটা প্রশ্নও পাঠক মনে উঠবে এই অমান্য করার দ্বারা হরিচাঁদের 'ঐশী ক্ষমতা' কি স্বয়ং তাঁর শিষ্যদের দ্বারাই অস্বীকৃত হলো না? মনে রাখ তে হবে, এটা কোন পারিবারিক ভাবাবেগাশ্রিত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ নয়।

অবশ্যই শেষ প্রশ্নের উত্তর সকলের জানা এবং সম্ভবত এই উত্তরের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে অন্য উত্থাপিত প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরও।

এমন ঘটনা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, যে এই গোস্বামী মশায় হরিচাঁদ ঠাকুরকে আদৌ 'স্বয়ং ঈশ্বর' ইত্যাদি রূপে বিবেচনা করতেন না। তিনি যে হরিচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার ছিল দুটি কারণ এক, হরিচাঁদের কিছু উপশম ক্ষমতা (healing power) ছিল, যা তাঁকে সাধারণের মনে 'ঐশীক্ষমতাবান' রূপে প্রতিষ্ঠা দেয় এবং হরিচাঁদের এই ক্ষমতার জন্যই মৃত্যুঞ্জয় তাঁর রোগমুক্ত হ'ন ও হরিচাঁদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় কারণ, হরিচাঁদের এই উপশম ক্ষমতা বা তথাকথিত ঐশী ক্ষমতাকে অবলম্বন করে তাঁর উপর অবতারত্ব আরোপ, এতে মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাইদের লাভ? খুবই স্বাভাবিক, 'স্বয়ং ঈশ্বরের' অবতারের শিষ্য সাধারণ মানুষের নিকট অন্য কোন-না-কোন হিন্দু দেব-দেবতার 'অবতার' হবেন। নিদেনপক্ষে অবতারের সঙ্গী সাধারণের নিকট যে অসাধারণ কেউকেটা হবেন, সে বিষয়ে কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

ভক্তি আক্রান্ত মানুষের নিকট এমন ব্যাখ্যা পীড়াদায়ক। কিন্তু সারা পৃথিবীর সমাজবিজ্ঞানীরা অবতার বা সন্ত ইত্যাদি গড়ে ওঠার এমন ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। প্রশ্ন হলো এ-ক্ষেত্রে যিনি 'অবতার' রূপে বিবেচিত হচ্ছেন, সেই হরিচাঁদ ঠাকুর কেন তাঁর অবতারত্বের প্রচার গ্রন্থ ''শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'' প্রকাশের বিরোধিতা করেন?

এই প্রশ্নের দুটি উত্তর বিবেচনা করা যেতে পারে। এক, হরিচাঁদ নমো জনগোষ্ঠীর ও ব্রাত্তণ্যতন্ত্রের অনুরূপ নিপীড়িত জাতের মানুষদের জৈব-জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে সমৃদ্ধি অর্জনের পথ নির্দেশ করেছেন। অথচ, ইতিপূর্বে কোন অবতার বা সন্ত মানুষের 'পার্থিব জীবনে' সমৃদ্ধি অর্জনের পথ প্রদর্শক নন, সকলেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের (?) পথপ্রদর্শক মাত্র।

দ্বিতীয় কারণ সম্ভবত এই যে, যদি হরিচাঁদ 'ঐশীক্ষমতাধর' হন, তবে তাঁর নির্দেশিত পথে চলতে হলে সকলেই অনুরূপ ক্ষমতার (অবতার কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীদের কথা স্মরণ করা যেতে পারে) অধিকারী হতে হবে। এখানেই মানুষের অর্জিত ক্ষমতা ও জন্মসূত্রে পাওয়া ক্ষমতার হেয়তর অবস্থা মানুষকে নিজের সম্পর্কে অবমূল্যায়ন করাবে যা অন্ততঃ মহান মানুষ হরিচাঁদের অভিপ্রেত হতে পারে না।

অতএব ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় রচিত এই তথাকথিত 'লীলাগ্রন্থ' শেষ পর্যন্ত হরিচাঁদের নির্দেশ অনুসরণ করা থেকে তাঁর অনুগামী মানুষদের বিচ্যুত করবে এবং তাঁরা সবাই হবেন প্রশ্নহীন ভক্তিতে আত্মসমর্পিত একদল মনোবলহীন মানুষ, যা আসলে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দার্শনিক লক্ষ্য। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র বিরোধী হরিচাঁদ, অতঃপর, এমন ব্রাহ্মণ্য উত্তরাধিকার বহনকারী গ্রন্থকে অনুমোদন দিতে পারেন নি। অবশ্য উক্ত ভূমিকায় হরিচাঁদ ঠাকুরের এই নিষেধাজ্ঞাকে এমনভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের সেটা উপযুক্ত সময় ছিল না। আবার শ্রী হরিবর সরকারই তাঁর 'ভূমিকায়' জানাচ্ছেন, ''মহাপ্রভু গ্রন্থ লিখিতে নিষেধ করেন।"

এথেকে আমরা কেবল এই সিদ্ধান্তই নিতে পারি, যে শ্রী হরিচাঁদ তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচনাতেই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, গ্রন্থ প্রকাশের কথা তো আসছে তারপরে। তাঁর গ্রন্থ রচনার উপর নিষেধাজ্ঞা জেনেও মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস এই গ্রন্থ রচনা করতে চান। শ্রী হরিবর সরকার জানাচ্ছেন, ''তথাপি মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছুক হইলেন।"

প্রশ্ন হলো, কবি তারক সরকার সহ শ্রীহরিচাঁদের নিকটতম সব অনুরাগী ব্যক্তির (স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয় গোঁসাই সমেত) নিকট যিনি 'পূর্ণব্রহ্ম', 'স্বয়ং' বা 'ঈশ্বর', সেই ঠাকুর হরিচাঁদের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করার সাহস অথবা স্পর্ধা সম্ভব কীভাবে? এমন স্পর্ধা যিনি প্রদর্শন করতে পারেন, তাঁকে কি হরিচাঁদ ঠাকুরের 'অনুগামী' বলা যায়? শিষ্য কি কখনও গুরুর আজ্ঞা অমান্য করতে পারেন? এমনই গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনকারী শিষ্যদের দ্বারা নিযুক্ত কবি তারক সরকার রচিত গ্রন্থ শ্রীহরিচাঁদের জীবন, জীবনদর্শন এবং তাঁর কর্মোদ্যোগের ঐতিহাসিক তথ্য ও ভূমিকা কি সঠিকভাবে উপস্থাপিত করেছে ভাবা যায়? এমন ভাবনা কি অসংগত বা অবাস্তব যে স্বয়ং গোঁসাই মৃত্যুঞ্জয়-এর ব্যক্তিগত অথবা গোঁসাইকুলের সমষ্টিগত কোন স্থূল স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যই হরিচাঁদের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁর 'জীবনীগ্রন্থ' *শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত* রচনা করার জন্য কবি তারকচন্দ্র সরকারকে বাধ্য করা হয়? হ্যাঁ, যথার্থই কবি তারক বাধ্য হন এই গ্রন্থ রচনায়। কেন এমন সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হই? এমন সিদ্ধান্তের কারণ শ্রী হরিবর সরকার লিখিত ভূমিকাতেই বর্তমান। তাঁর বয়ানেই জানা যাক সে কথা

''কিন্তু দৈব নির্ব্বন্ধন, লিখিত লীলাগ্রন্থ শ্রীধাম হইতে হারাইয়া যায়। সুতরাং বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় গ্রন্থ লিখিতে নিরস্ত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে, আন্তরিক গাঢ় অনুরাগের উত্তেজনায়, উক্ত বিশ্বাস মহাশয়, পুনরায় লিখিতে কবি রসরাজ (তারক সরকার) মহাশয়কে অনুরোধ করেন। তদুত্তরে কবি রসরাজ মহাশয় বলিলেন, গোস্বামী আমি লেখা জানি না, পড়া জানি না, অতীব মূর্খ, অতি মূঢ় যাহা জানি না তাহা বলিবার নয়...। অতএব গ্রন্থ লিখিতে, অযোগ্য ও অক্ষম বলিয়া আমাকে ক্ষমা করুন।" (হুবহু উদ্ধৃতি)

শ্রীহরিবর সরকার তাঁর কবিয়াল গুরু শ্রী তারক চন্দ্র সরকার সম্পর্কে এই তথ্য আমাদের জানাচ্ছেন। অর্থাৎ আমরা জানলাম, কবি নিজেকে (হয়ত বিনয়বশত) হরিচাঁদের জীবন ও দর্শন সম্পর্কে অতি মূঢ় বলে ঘোষণা করছেন এবং এই 'মূঢ়তা' নিয়েই কবি ইতিপূর্বে যে 'লীলাগ্রন্থ' রচনা করেছিলেন 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' সেই গ্রন্থ। কেননা, শ্রী হরিবর সরকার মশায় আমাদের জানাচ্ছেন

''অতঃপর অনেক দিন পরে, একদা রাত্রি যোগে স্বপ্নাদেশে বাক্যবিনোদিনী দেবী সরস্বতী আসিয়া কবি রসরাজ মহাশয়কে বলিলেন— তারক বহুদিন পূর্বে শ্রীধামে ওড়াকান্দী হইতে,

তোমাদের কৃত প্রভুর লীলাগ্রন্থ, তখন প্রকাশের অসময় বলে, তাহা আমার নিকট রাখিয়াছিলাম; এই তোমাদের সেই গ্রন্থ লও...। (ঐ)

অতএব, সন্দেহ করার কোন কারণ নেই, যে-গ্রন্থ না লেখার জন্য হরিচাঁদ আদেশ করেছিলেন, সেই গ্রন্থই, শ্রীহরিবর সরকারের ভাষায় ফেরৎ দেন। দেখা যাচ্ছে স্বয়ং 'ঈশ্বরের' ইচ্ছাকে তারই অধীনস্ত একদেবী সরস্বতী অমান্য করছেন। হ্যাঁ, হরিচাঁদের একান্ত স্বঘোষিত অনুগামী বিশিষ্ট জনেরা একথা জানাচ্ছেন। অবশ্যই কবি স্বপ্নের কথাবার্তা সরাসরি শ্রী হরিবর সরকারের জানার কথা নয়, যদি না কবি তারক সরকার এবিষয়ে তাঁকে অবগত করেন।

স্পষ্টতই, বেদবিধি না-মানা, ব্রাহ্মণকে না-মানা শ্রী হরিচাঁদের অনুরাগী (অনুগামী?) এই কবি বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্য 'দেবী' সরস্বতীতে আস্থা রাখেন। এরপরও কি আমরা ভাবতে পারি কবি তারক সরকার রচিত 'লীলাগ্রন্থ' আর দশটা ব্রাহ্মণ্য পুরাণকাহিনী (কাহিনী, ইতিহাস নয়) থেকে ভিন্ন হবে, হবে ঐতিহাসিক দলিল?

বস্তুত বৈদিক উত্তরাধিকারের হাত ধরে ব্রাহ্মণ্য তথা হিন্দু ধর্মের সুবিধাভোগীরা শ্রমজীবী নানাজাতের মানুষের উপর যে মানবেতর নিপীড়ন সামাজিকভাবে আরোপ করেছিলেন তারই বিরুদ্ধে ছিল হরিচাঁদ ঠাকুরের সংগ্রাম। আর আমরা দেখছি, সেই মহান মানব প্রেমিক, মানবতার প্রতি দায়বদ্ধ হরিচাঁদের স্বঘোষিত 'অনুগামী' গোঁসাইরা ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মানসিকতাপুষ্ট এক তথাকথিত 'লীলাগ্রন্থ' জোর করেই এক স্বঘোষিত 'মূঢ়', 'অজ্ঞ' কবিকে দিয়ে রচনা করালেন। হ্যাঁ, জোরজবরদস্তি করেই। কেননা, ঐ ভূমিকাতেই শ্রীহরিবর সরকার আমাদের জানাচ্ছেন

''কিয়দ্দিন গত হইলে পরলোকগত মহাভাবময় প্রভুপাদ গোস্বামী গোপালচাঁদ উন্মত্তাবেশে একদা শেষ নিশাতে স্বপ্নাদেশে ভীষণ 'নৃসিংহমুর্ত্তি' ধারণ করিয়া'' কবি রসরাজ মহাশয়ের বক্ষপরে নখ বাধাইয়া দিয়া বলিলেন— ''হয়ত প্রভুর লীলাগ্রন্থ দে, নচেৎ তোর বক্ষ চিরিয়া রুধির পান করিব।'' তখন কবি রসরাজ অগত্যা স্বীকার করিলেন...।

দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থটি লেখার জন্য কবির উপর গোস্বামীদের প্রবল চাপ ছিল যা তাকে মানসিকভাবে বিচলিত করেছিল। ফলে এইসব গোস্বামীদের মধ্যে যিনি সব চাইতে বেশি অস্বাভাবিক আচরণ দ্বারা হরিচাঁদের অনুরাগীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং যিনি সাধারণের নিকট যথেষ্ট ভীতিপ্রদ ছিলেন সেই গোস্বামী গোলক চাঁদকে কবি স্বপ্নে পর্যন্ত দেখেন এবং তাঁর স্বপ্ন-শাসানিতে ভীত কবি এই 'লীলাগ্রন্থ' লিখতে শুরু করেন। অথচ কবি ব্রাহ্মণ্য দেবী সরস্বতী, কবিয়াল শ্রী হরিবর সরকারের তথাকথিত বাক্যবিনোদিনীও (আসলে ব্রাহ্মনের কাছে এই 'দেবী' তো কেবল বিনোদিনী ন'ন, তিনি তো জ্ঞানেরও দেবী! কবিয়াল শ্রীহরিবর সরকার অবশ্য লোককে কেবল বিনোদনই বিলিয়েছেন তো! যদি একটু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধুরন্ধর জ্ঞানীদের দার্শনিক বলা উচিৎ ব্রাহ্মণ্য স্বার্থের শ্রেণী দার্শনিক প্রজ্ঞা সম্পর্কে কবি সচেতন থাকতেন তা হলে জানতে পারতেন, কেন এদেশে চির ব্রাহ্মণ্য দাসব্যবস্থার কবলিত এবং তখন তিনি এই দেবীকে দিয়ে শ্রী তারক সরকার মহাশয়কে স্বপ্ন দেখাতেন না। কবি তারকও এই বিনোদন রসের কারবারি— মানুষকে বিনোদন দিতে চেয়েছেন ঐ সরস্বতীর সব 'বরপুত্রদের' রচিত শাস্ত্রকে অবলম্বন করে। এরই ফলে তাঁর বিনোদন প্রচেষ্টা কেবল তার স্বজনগোষ্ঠীর মানুষের নিজেদের নিগৃহীত জীবন সম্পর্কে উদাসীন করেছে, কিছুক্ষণের জন্য এই মানুষজন তাঁদের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রাশ্রিত ঘৃণ্য জীবনকে ভুলে থাকতে পেরেছেন। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের শ্রমজীবী (শূদ্র) বিরোধিতার দর্শনকে তিনি জ্ঞানালোক দিয়ে এই সব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের মধ্যে অনুসন্ধান করতেন তা হলে ঐ বিনোদনের সঙ্গে তাঁর শ্রোতৃমন্ডলী তাঁদের মুক্তির পথও অনুসন্ধানে সফল হতেন। কবিকে দিয়ে 'লীলাগ্রন্থ' রচনা করাতে পারেন নি।

কবি হরিবর সরকারের বাক্যবিনোদিনী স্বপ্নে এসে কবি তারক সরকারকে তাঁর রচিত 'লীলাগ্রন্থ' ফেরৎ দিয়ে গেলেও কবি তারক গ্রন্থ রচনা করতে অপারগ থাকলেন। (যদিও স্বপ্নে প্রাপ্ত জিনিষ স্বপ্নভঙ্গে হাতে পাওয়ার কথা শোনা যায় না হয়ত এজন্য) কবি হরিবর সরকার জানাচ্ছেন

''তথাপি তিনি লিখিতে নিরস্ত থাকেন। পরে নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট স্বামী মহানন্দ পাগল অহরহ সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া বারংবার অনুরোধ করায়ও তিনি গ্রন্থ লিখিলেন না।'' (ঐ)

দেখা যাচ্ছে এমন এক গোস্বামী যিনি 'নিত্যানন্দ শক্তি বিশিষ্ট' (অর্থাৎ, শ্রী গৌরাঙ্গের সহচর নিতাই গোস্বামীর শক্তি বিশিষ্ট? নাকি নিত্য আনন্দে থাকার শক্তি সম্পন্ন?) তাঁরও অনুরোধে কবি তারক সরকার আর 'লীলাগ্রন্থ' লিখতে রাজি ছিলেন না। কেন রাজি ছিলেন না কবি? স্বয়ং ব্রাহ্মণ্যদেবী সরস্বতী তাঁর ''প্রভুর লীলা'' প্রকাশ করতে বলা সত্ত্বেও কবি কেন 'লীলাগ্রন্থ' রচনায় অনাগ্রহী হন? যে-সরস্বতীর 'ইচ্ছায়' এই কবি 'কবিয়াল' সেই সরস্বতীর নির্দেশ অমান্য করেন যে কবি, তিনি কেন তা হলে গোস্বামী গোলকচাঁদের 'নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ'—এর ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন? সে কি হরিচাঁদের নিষেধাজ্ঞা আর গোসাঁইদের পীড়াপীড়ির মধ্যে দোলাচলতা হেতু? এবিষয়ে স্বয়ং কবিয়াল তারক সরকারের রচিত শ্লোক থেকেও আমরা অবগত হতে পারি। প্রথমে আমরা কবি তারক-এর বয়ানে 'লীলামৃত' সম্পর্কে হরিচাঁদ-এর প্রতিক্রিয়া জেনে নিতে পারি

কিছু অংশ লেখা হলে দুই মহাশয়।
মহাপ্রভু হরিচাঁদে পড়িয়া শুনায়।।
মহাপ্রভু ডেকে বলে শুন মৃত্যুঞ্জয়।
লীলাগীতি লেখা এবে উচিৎ না হয়।।

ক্ষান্ত কর লেখালেখি বাহ্য সমাচার।
অন্তরের মাঝে রাখ আসন আমার।। (লীলামৃত,পৃ.৫)

এতদ্‌সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয় লেখার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করলেল হরিচাঁদ-এর প্রতিক্রিয়া ছিল এরূপ

মহাপ্রভু বলে জান এ কর্ম্মে পুরস্কার।
কুষ্ঠ ব্যাধি হবে চেষ্টা করিলে আবার।। (ঐ, পৃ৫)

অন্যতম প্রিয়শিষ্য মৃত্যুঞ্জয়কে এমন কঠোর ভাষায় দুরারোগ্য ব্যাধির ভয় দেখিয়ে নিষেধাজ্ঞা জানালেন হরিচাঁদ যে অপরাধে, সেই 'লীলাগ্রন্থ' রচনা কি আদৌ কোন অপরাধ? হরিচাঁদ-এর মত এমন মানবদরদি মানুষ কেন এতটা ক্ষুব্ধ হলেন?

এ ঘটনায় সম্ভবত কবি তারক ভীত হয়ে পড়েন এবং গ্রন্থ রচনা সম্পূর্ণ করা থেকে কেবল বিরত হন না, ইতিপূর্বে রচিত অংশকে তিনি লুকিয়ে রাখেন। অবশ্য এই লুকিয়ে রাখার ঘটনাটি ব্রাহ্মণ্য-বৈষ্ণব কবি তারক ঐ ব্রাহ্মণ্য পুরাণ কাহিনীর নিখুঁত অনুসরণে এভাবে উপস্থাপিত করেন

হেনকালে দৈবযোগে লীলাগ্রন্থখানি।
আপনি হরিয়া লন দেবী বীণাপাণি।। (ঐ, পৃ৫)

ইতিমধ্যে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত। শ্রী হরিচাঁদের জীবনাবসান ঘটেছে এবং অতঃপর,

কিছুকাল পরে দেবী স্বপ্নযোগে কয়।।
অসময় বলি আমি প্রভু আজ্ঞা মতে।
লয়েছিনু লীলাগীতি তব অসাক্ষাতে।।
এবে বটে সুসময় নাহি কর দেরী।
প্রচার করহ লীলা অমৃত লহরী।। (ঐ, পৃ৫)

দেখা যাচ্ছে শ্রী হরিচাঁদ-এর জীবিত কালে নয়, তাঁর মৃত্যুর পর হলো এই পুস্তক রচনার 'সুসময়'। এ থেকে বুঝতে পারা যায়, মৃত্যুঞ্জয়, দশরথ ও তারক গোসাঁই সাহস করে হরিচাঁদের জীবিত কালে এই 'লীলামৃত' রচনা করতে সাহস পান নি। কিন্তু প্রশ্ন হলো গুরু যাঁদের 'ঈশ্বরের' অবতার, সেই গুরুর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করা কেন? এই গোসাঁইদের এমন 'ঈশ্বর' বিরোধী আচরণ কী ইঙ্গিত করে? কোন 'পার্থিব' প্রাপ্তি?

যে দেশে সব সাধু-সন্তরা তাঁদের অনুরাগী ভক্ত-শিষ্য দ্বারা প্রচারের আলোয় আসেন সেদেশে জন্ম নিয়ে শ্রী হরিচাঁদের এমন বিপরীত ভুমিকা কেন? তাঁর যথার্থ জীবনচরিত পাঠ করে তাঁর নিজ জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটলে তাঁদের 'মুক্তি' ঘটত অপেক্ষাকৃত কম সময়ে। যে মানুষদের জন্যই তিনি সংগ্রাম করেছেন, সেই মানুষদের মধ্যে তাঁর যথার্থ পরিচিতি ব্যাপ্ত হলে ঐ মানুষেরা তাঁদের জীবন-সংগ্রামে অনেক বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী ভুমিকা পালন করতে পারতেন। এরূপক্ষেত্রে সাগ্রহে এমন গ্রন্থের প্রচারকে তো সমর্থন করার কথা এই পথপ্রদর্শক মানুষটির! তবে কেন তাঁর 'লীলাগ্রন্থ' প্রচারে বিরোধিতা?

এ প্রশ্নের উত্তর দেননি শ্রীহরিবর সরকার, উত্তর দেননি তাঁর গুরু কবি তারক সরকার। যদিও একটা অপ্রতক্ষ্য উত্তর হরিচাঁদের নিদের্শের মধ্যে ঐ কবির বয়ানে পাওয়া যায়

অন্তরের মাঝে রাখ আসন আমার।।

এমন নির্দেশের অর্থ তো এই, যে হরিচাঁদ তাঁর দর্শন, তাঁর মতাদর্শকে অনুসরণ করতে বলছেন তাঁর অনুরাগী নয়, অনুগামীবৃন্দকে! মানুষের মধ্যে কোন দর্শন বা মতাদর্শকে যথাযথভাবে প্রচার করতে হলে সেই দর্শন ও মতাদর্শকে ইতিহাস ও সমকালের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত করতে হয়। সেখানে মধ্যযুগীয় রহস্যময়তা বা কাল্পনিক 'অত্যাশ্চর্য্য' ঘটনার দ্বারা জৈবিক জীবন যাপনের, গৃহীর জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করা যায় না। কোন মধ্যযুগীয় ধর্মগুরু তাঁর 'অনুগামীদের' পার্থিব জীবনযাপনের পথনির্দেশ করেন নি, তাঁদের নির্দেশিত পথের ঠিকানা ছিল কোন এক মরনোত্তর 'জগতের'। কেন না, এসব অলৌকিকতা বা 'অত্যাশ্চর্য' ঘটনা যেহেতু সাধারণ মানুষের জীবনে ঘটে না, তাই তারা আরো অসহায়তার শিকার হ'ন এবং জীবন সংগ্রামার্জিত আত্মবিশ্বাসকে হারিয়ে ফেলেন, এবং অতঃপর, তারা 'ভাগ্য' নির্ভর বা 'দৈব' নির্ভর হয়ে পড়েন, যে নির্ভরতা জীবন সংগ্রামের 'এই জগতে' তাঁদের গুরু-গোসাঁই নির্ভর করে তোলে। অথচ হরিচাঁদ তাঁর জনগোষ্ঠীকে আত্মশক্তিতে বলিয়ান করতে চেয়েছিলেন। এমন বলীয়ান হতে গেলে মানুষকে এমন শিক্ষা পেতে হবে যার সাহায্যে মানুষ সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির যথার্থ মূল্যায়ন ও মুকাবিলা করতে পারে, পারে সমকালীন উপযোগী নৈতিক ও শিক্ষা–সাংস্কৃতিক অবস্থান অর্জন করতে। হরিচাঁদকে 'অবতার' বানিয়ে, অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বানিয়ে, ঐসব 'অত্যাশ্চর্য' ঘটনার গল্প-কাহিনী দিয়ে মানুষকে তার সমকাল সম্পর্কে সচেতন করা যায় না এবং অতঃপর মহান হরিচাঁদের মুল লক্ষ্য থেকে এমন 'লীলাগ্রন্থ' তাঁর অনুগামীদের, তাঁর নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যথারীতি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক মানেবতর, কারাগারেই শেষ পর্যন্ত বন্দী করে রাখে। তাই কি হরিচাঁদ এমন গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি জানান?

কবি অবশ্য সুকৌশলে তাঁর এই আপত্তি জানানো পংক্তির মধ্যে 'এবে' শব্দটি ব্যবহার করেছেন যা ইঙ্গিত করে বর্তমানে প্রকাশে আপত্তি থাকলেও ভবিষ্যতে প্রকাশ করা যাবে। আর তাই ব্রাহ্মণ্য দেবী সরস্বতীর মাধ্যমে কবি স্বপ্নযোগে হরিচাঁদ তথা 'প্রভুর' অনুমোদন অর্জন করেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে-গ্রন্থ ভবিষ্যতে প্রকাশ করা চলবে, সেই গ্রন্থ বর্তমানে প্রকাশে আপত্তি জানাতে কেন এই মহান ব্যক্তি ব্রাহ্মণ্য পদ্ধতিতে কুষ্ঠ হওয়ার 'অভিশাপ' দেবেন? আরো লক্ষ করার যে এমন কী 'স্বয়ং' ঈশ্বর বা তার 'অবতার' হরিচাঁদের 'আজ্ঞা' নিয়ে ব্রাহ্মণ্যদেবী সরস্বতী, 'বাক্যবিনোদিনী' সরস্বতী কবি তারককে গ্রন্থ প্রকাশ করতে নির্দেশ দিলেও কবি গ্রন্থ রচনায় অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কবির এই 'স্বপ্ন কান্ড' অবগত হলে

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ পুনঃ দুই জনা।
বলিলেন লীলামৃত করিতে রচনা।। (ঐ, পৃ.৫)

কিন্তু কবি কী করলেন?

চরণ ধরিয়া তবে বলিল তারক,
স্বীকার করিনু আমি তোমার সেবক।।
অতি দীন অভাজন আমি মূঢ়মতি।
এ লীলা বর্ণিতে মম না হবে শক্তি।। (ঐ, পৃ.৫)

কবির কাছ থেকে এই বৃত্তান্ত জানার পর তো কিছু প্রশ্ন তুলতেই হয়। 'স্বয়ং ঈশ্বর' কবির 'শক্তি'-তে আস্থা রেখে যে-দেবীর কৃপায় সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র রচিত সেই 'বাক্যবিনোদিনী'র

মাধ্যমে নির্দেশ পাওয়ার পরও কেন কবি তারক অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন? কবি কি তাঁর কবিসত্ত্বা, তাঁর সত্যদৃষ্টির অবস্থান অথবা শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের জীবিতকালের নির্দেশপ্রাপ্ত অবস্থান এবং গোস্বামীদ্বয়ের পীড়াপীড়ির মধ্যে এক অসহায় অবস্থায় পড়েছিলেন এতে কি তাঁর মনের শান্তি বিপর্যস্ত হয়েছিল, যার জন্য তিনি এমন সব স্বপ্ন দেখেন? কবি কি হরিচাঁদের নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধ সম্ভাবনায় দুই গোস্বামীর কাছে গ্রন্থ রচনায় অক্ষমতা প্রকাশ করেন?

অবশ্য কবি জানাচ্ছেন, যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের শাস্ত্রবিধান অমান্য করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হরিচাঁদ, সেইসব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রের নানা কাহিনীর উল্লেখ করে গোস্বামীদ্বয় তাঁকে নানাভাবে 'লীলাগ্রন্থ' রচনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। প্রথমে অবশ্য নিজেদের ক্ষমতার উপর গোস্বামীরা আস্থা রেখে কবিকে উৎসাহিত করার চেষ্টা করেন

দুই প্রভু বলে হরিচাঁদে রেখে ভক্তি।
লিখিতে আরম্ভ কর হবে তোর শক্তি।।
বিশ্বাস না করিস মোদের কথা ধর।
লিখিতে পারিবি গ্রন্থ তোকে দিনু বর।। (ঐ, পৃ.৫)

তবুও তারক অসম্মত হলে গোসাঁইদ্বয় বিভিন্ন ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র এবং মুনিদের কথা উল্লেখ করে তাঁকে প্রশ্ন করেন

তোর কেন ভয় হল করিতে রচনা।
তোর জন্য তপস্যা করিব দুজনা।।
সব কর্ম সেই করাইবে তোরে দিয়া।
রচনা করহ গ্রন্থ তাহারে ভাবিয়া।। (ঐ, পৃ.৫)

তবু কবি দ্বিধান্বিত

এইভাবে কতদিন গত হয়ে গেল।
পারিব না ভেবে গ্রন্থ লেখা নাহি হল।। (ঐ, পৃ.৬)

এবং গোস্বামীদ্বয়ের পীড়াপীড়ির ফলে, অথবা 'যার ধর্ম্ম সেই করাইবে' ভেবে কবি আবার সেই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক কৌশল গ্রহণ করেন

একদিন দেবযোগে নিশি অবসানে।
গোসাঁই গোলক এসে দেখায় স্বপনে।।
নরহরি রূপ ধরি বুকে হাটু দিয়া।
বক্ষঃস্থলে দিল হস্ত নখ বাঁধাইয়া।।
বলে তোরে নখে চিরি করি খান খান।
নৈলে 'শ্রীশ্রী হরিলীলামৃত' পুঁথি আন।। (ঐ, পৃ.৬)

মৃত্যুঞ্জয় ও দশরথ গোসাঁই-এর উক্ত বরদানের পর ইতিমধ্যে দীর্ঘ চব্বিশ বৎসর অতিক্রান্ত। এবার কবি সরকারের 'লীলাগ্রন্থ' রচনার অভিপ্রায় জাগে এবং অতঃপর, আবার সেই ব্রাহ্মণ্য অপকৌশল অনুসরণ করে তিনি গোলক গোসাঁইকে দিয়ে নতুন এক অত্যাশ্চর্য স্বপ্নের আমদানি করেন

মৃত্যুঞ্জয় দশরথ বর দিয়াছিল।
চতুর্ব্বিংশবর্ষ এই গত হয়ে গেল।।
পুঁথি যদি না লিখিবি তোর রক্ষা নেই।
পুস্তক লিখিস যদি ছেড়ে দিয়ে যাই।। (ঐ, পৃ.৬)

কেবল এই স্বপ্নে দেখা ভীতি নয়, কবির যে 'লীলাগ্রন্থ' লেখার যোগ্যতা আছে, সে সম্পর্কে কবি গোলক গোসাঁইকে দিয়ে তাঁর 'দৈব' জন্ম বিবরণ ও কবিয়াল হ'য়ে ওঠার কাহিনীও আমাদের জানিয়েছেন এবং এমন কি ব্রাহ্মণদের শংসা পত্রের কথাও আমাদের অবগত করেন

ইতিনায় ভট্টাচার্য পাড়া হয় গান।
সুকবি বলে তোরে দিয়াছে আখ্যান।। (ঐ, পৃ.৬)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মতুয়া কবি বেদ-বিরোধী, ব্রাহ্মণবিরোধী হরিচাঁদের জীবনীকার হলেন বেদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাসী ব্রাহ্মণের পতাকাবাহী এক কবি। সেই গ্রন্থে যথার্থ হরিচাঁদকে আমরা কতটা পেতে পারি? যে-হরিচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্য নিপীড়নে জর্জরিত এদেশের চিরায়ত শ্রমজীবী মানুষের চেতনা থেকে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার অবলুপ্তি চেয়েছিলেন, সেই হরিচাঁদের জীবনী যদি লেখেন ব্রাহ্মণানুরাগী কবি তারক সরকার তবে তা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম শাস্ত্রাদির মতই 'অত্যাশ্চর্য' কল্পকাহিনীতে পরিপূর্ণ হবে এবং তা পাঠ করে শ্রমজীবী মানুষ যে ঐ ব্রাহ্মণ্য দাসত্বমেনে নেবেন সে বিষয়ে কি কোন সন্দেহ থাকে! মতুয়াদের বর্তমান জীবনাচার যে ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় আক্রান্ত তা তো আর গবেষণার বিষয় নয়! একজন মতুয়া আর ধমট হিন্দুর মতই নিজেকে হিন্দুই ভাবেন এবং অতঃপর তিনি সেই হরিচাঁদকে অস্বীকার করেন যিনি

বেদ-বিধি নাহি মানে না মানে ব্রাহ্মণ।

হরিচাঁদের এই নির্দেশ মতুয়ারা অগ্রাহ্য করেন এবং তারপরও তাঁরা হিন্দু দ্বিচারিতার উত্তরাধিকার বহন করে থেকে যান মতুয়া, নিজেদের ঘোষণা করেন ঠাকুর হরিচাঁদের অনুরাগী বলে।

এবং হরিচাঁদের অনুগত সঙ্গী গোসাঁই গোলকও যে যথার্থই হরিচাঁদের জীবনাদর্শনের অনুগামী ন'ন, তিনিও যে ব্রাহ্মণ্য ধাপ্পায় বিশ্বাসী সেকথা কবি তারক স্বয়ং আমাদের জানিয়েছেন। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ কাহিনী সবই ব্রাহ্মণ্য সমাজ বিধি গলাধঃকরণ করাবার জন্য সৃষ্ট মনোরম সাহিত্যকর্ম। তাকেই সত্য বলে স্বয়ং গোলকও মানেন এবং তারপর তিনি মতুয়াও থেকে যান। তিনি কবি তারককে জানাচ্ছেন

স্বপনেতে কেহ যদি পুঁথি করে দান
সেজন পন্ডিত হয় পুরাণে প্রমান।। (ঐ, পৃ.৬)

অবশ্যই এ বিশ্বাস স্বয়ং কবি তারকেরও। তাই কি হরিচাঁদ অর্থাৎ ব্রহ্মণ্য শাস্ত্রানুসারী জীবনী রচনা করার জন্যই কি হরিচাঁদ কবি তারক কর্তৃক রচিত গ্রন্থ প্রকাশে আপত্তি জানিয়েছেন?

কবি তারকের এই ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উত্তরাধিকার এতটাই প্রবল, যে তিনি নিজেরও 'দৈ' জন্ম নির্মান করেন। তাঁর পিসিমার মুখে কবি তারক তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানাচ্ছেন

তোর জন্ম বিবরণ তোর মনে নাই।
মৌখিক শুনিলি তোর পিসিমার ঠাঁই।।
তোর পিতা কাশীনাথ ছিল কালী ভক্ত।
.....
অপুত্রক ছিল বংশে পুত্র না জন্মিল।
বংশ রক্ষা হেতু দুর্গা বলিয়া কাঁদিল।।
বটপত্রে লক্ষ দুর্গানাম লিখে পরে।
সপ্তাহ পর্যন্ত শিব স্বস্ত্যয়ন করে।। (ঐ,পৃ.৭)

ইত্যাদি...

নবকুমার শর্মা পুরোহিত এসে।
পূজা করে জগদ্ধাত্রী পূজার দিবসে।।
সপ্তাহ পর্যন্ত চন্ডী করিল পঠন।
অষ্টম দিবসে দিল ব্রাম্ভণ ভোজন।।
.....
মার্গশীর্ষ অমাবস্যা শনিবার দিনে।
তোর মাতা প্রসব করিল শুভক্ষণে।।
নাম করণেতে নাম রাখিল তারক।
আচার্য বলিল পুত্র হইবে রচক।। (ঐ,পৃ.৭)

আমরা প্রসঙ্গত স্মরণ করতে পারি, এ সময় নমোরা ব্রাহ্মণ্য সমাজ বর্হিভূত 'চন্ডাল'। কিন্তু সেটা অন্য প্রসঙ্গ অন্তত এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি, রামায়ণ, মহাভারত বা অন্যান্য পুরাণ কাহিনীতে নানা অবতারের বা 'শাপভ্রষ্ট' দেবতাদের জন্মবৃত্তান্তের সঙ্গে কবি তারকের জন্মের বেশ মিল আছে। কবি তারক এক 'দৈব' ব্যবস্থাজাত সন্তান এবং তিনি যে কবি (রচক) হবেন সেকথাও কোন এক আচার্য ব্রাহ্মণ জানিয়েছিলেন তাঁর জন্মক্ষণেই। এমন ব্রাহ্মণে আস্থাশীল কবি যদি কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনবৃত্তান্ত লেখেন তখন তো সে জীবনীকে হতেই হয় ঐ ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র ও নানা পুরাণের অনুকরণ, অনুসরণ এবং অতঃপর ব্রাহ্মণ্যধাপ্পার আকর। যে কোন ইতিহাস সচেতন, সমাজ সচেতন পাঠক মাত্রেই কবি তারকের রচিত 'শ্রীশ্রীহরিলীলাকৃত' থেকে এমন সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন।

আরো একটা চমকপ্রদ কথাও কবির ঐ গোলক গোসাঁই-এর স্বপ্নভাবনা থেকে জানতে পারি।

সেটা হল, এই 'লীলাগ্রন্থ' রচনায় কবি তারক আসলে বাজীকরের হাতের কাঠের পুতুলমাত্র, আসল লেখক হলেন কে? জানা যাক

বাজীকর ছায়াবাজী দেখায় বিপুল।
না চাইতে পারে তারা কাষ্ঠের পুতুল।।
গোস্বামী লোচন দশরথ মৃত্যুঞ্জয়।
তুই কাষ্ঠ পুত্তলিকা তেমনি নাচায়।। (ঐ,পৃ.৭)

কবি তারক সরকার, অতঃপর ছিলেন উক্ত গোস্বামীদের হাতে এক কাঠের পুতুল মাত্র। তাঁরা কবিকে যা লিখতে বলেছিলেন, কবি তাঁর কবিত্বের দ্বারা তাই লিখেছেন মাত্র

মৃতুঞ্জয় দশরথ আর মহানন্দ।
তোরে করে ফেলাফেলি তাদের আনন্দ।। (পৃ.৭)

কেবল তাই নয়, গোসাঁইদের নির্দেশ

শীঘ্র করি লেখ মোর প্রভুর মহিমে।
লেখ লেখ যাহা তোর উঠিবে কলমে।।
.....
কোন ঠাঁই লিখিতে হইলে কিছু সন্ধ।
আরোপে দেখিবি হরি-চরনারবিন্দ।। (পৃ.৭)

তাহলে 'আরোপ' করে, নিজের খুসিমত সন্দেহ (সন্ধ) জনক স্থলে নিজের কল্পনাকে প্রয়োগ করতে পারবেন কবি। এমন পরামর্শ কবিকে দিচ্ছেন স্বয়ং হরিচাঁদের সঙ্গী অনুগামী (?) এক গোসাঁই! আমরা জানি, কবির কিছু 'ছাড়' পাওনা থাকে, কিন্তু সে তো তথ্যকে মহিমান্বিত করার জন্য। অথচ এখানে কবির কলমে যা উঠবে তাই লেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আবার এই কবি গোস্বামীদের হাতে 'কাষ্ঠ পুত্তলিকা'। তাই এই গ্রন্থ রচনায় কবির কলমে যা উঠেছে তা তাঁর নিজস্ব ভাবনার বা জানা তথ্য নয়, গোসাঁইদের সরবরাহ করা তথ্য। তাই কবির এই হরিচাঁদ জীবনী, এই 'লীলাগ্রন্থ', যা একান্তভাবেই ব্রাহ্মণ্য ভাবাদর্শে রচিত তা কার্যত হরিচাঁদকে ধর্মগুরু বা অবতার বানাবার গোস্বামীদের এক ব্রাম্ভণ্যতান্ত্রিক উত্তরাধিকারের ফলশ্রুতি। (এ ঘটনা থেকে বুঝতে পারা যায়, গোস্বামী মৃত্যুঞ্জয়, লোচন আর দশরথের বয়ানে লেখা এই গ্রন্থ, যা আদৌ হরিচাঁদ ঠাকুরের মানব প্রেমিক রূপে নয়, উপস্থাপিত করে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক এক অবতার রূপে।) মহান হরিচাঁদ তাঁর জনগোষ্ঠীকে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালনের পথনির্দেশ দিয়েছিলেন সে পথ তাঁর পুত্র আর এক মহান ব্যক্তিত্ব গুরুচাঁদ সরাসরি পিতায় সাহায্য হেতু যথাযোগ্যভাবে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন। কিন্তু যেসব গোসাঁই হরিচাঁদকে অবতার বানিয়ে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের বিভ্রান্ত করেছেন, ইতিহাসের পথে যোগ্য ভূমিকা পালন থেকে বিচ্যুত করেছেন, সেইসব গোসাঁই আর দশটা অবতারের সঙ্গী সাথীদের ভুমিকা পালন করেই হরিচাঁদকে এবং তাঁর মতাদর্শকে গণমানুষ থেকে আড়াল করেছেন। আর এজন্যই হরিচাঁদের নিজ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা ইতিহাস সৃষ্টিকরার পরিবর্তে হয়েছেন ইতিহাসের হাতে ক্রীড়ানক। কবি তারক সরকার কেবল গোসাঁইদের খুশি করতে গিয়ে নয়, নিজের ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক প্রচেষ্টা দ্বারা তাঁর স্বজনগোষ্ঠীর মানুষদের চেতনাকে

ব্রাহ্মণ্য দাসত্বে আবদ্ধ করেছেন।

কবির স্বপ্নাবেশকে সত্য ধরে নিলে একটা প্রশ্ন তো পরিহার করা যায় না, যে কেন তাঁর এমন স্বপ্নঘোর লাগল? স্বপ্ন বিশেষজ্ঞরা এর উত্তর হয়ত জানেন। কিন্তু বুঝতে পারা যায়, গোস্বামীদের জবরদস্তি কোন পর্যায়ে ওঠায় কবি তারক মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হয়েছিলেন যে শেষপর্যন্ত 'লীলাগ্রন্থ' রচনা করতে তাকে ঐ ভয়ংকর স্বপ্নের গল্পটি উদ্ভাবন করতে হয়েছে। আসলে তাঁর অসম্পূর্ণ রচনা সম্পূর্ণ করা ও প্রকাশ করার জন্যই এই গল্পের অবতারণা। বস্তুত ব্রাহ্মণ্য গাল-গপ্পের সুবিপুল আমদানির ফলে এই গ্রন্থ থেকে অসাধ্য সাধন করেই পাঠককে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরকে আবিষ্কার করতে হবে।

শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুর এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আর তাই তাঁকে জানতে, বুঝতে চাই তথ্য, ঐতিহাসিক তথ্য, যে তথ্যের শরীরে বাহিত হয় কাল ও সমসাময়িক ও সমকালীন ঘটনার প্রতিফলন। অথচ শ্রী হরিবর সরকার এই 'লীলাগ্রন্থ'—এর ভুমিকায় লিখছেন

''অধুনা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ঘটনাবলীর সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার অক্ষমতা দৃষ্ট হয় এই সম্প্রদায়কে আমার বক্তব্য এই আশ্চর্য্য বিচিত্রপূর্ণ জগতের বিশেষত ধর্ম্মজগতের ঘটনাবলী, মানুষের পক্ষে সমস্তই আশ্চর্য্যপূর্ণ। ধর্ম্মজগতের ইতিহাসে, সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অতীব আশ্চর্য্য ঘটনার বিবরণ দৃষ্ট হয়। শ্রীশ্রী মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের জীবনের ঘটনাবলী, সমস্তই আশ্চর্য্য ঘটনাপূর্ণ। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের ধর্ম্ম প্রভু যীশুর জন্মজীবনী ও কার্যকলাপ আশ্চর্য ঘটনাপূর্ণ। কিন্তু তাই বলিয়া, এই সমস্ত ঘটনাবলীর সত্যতায় কেহই সন্দিহান হয় না।'' (হুবহু উদ্ধৃত)

তা হলে দেখা যাচ্ছে, 'পাশ্চাত্য' শিক্ষায় 'শিক্ষিত' এদেশীয় 'সম্প্রদায়' ধর্মগুরুদের 'জীবনে' ঘটিত আশ্চর্যজনক ঘটনায় অবিশ্বাসী হলেও সেই পাশ্চাত্যের লোকদেরই ''এই সমস্ত ঘটাবলীর সত্যতায় কেহই সন্দিহান হয় না।''

খুবই স্বাভাবিক যে প্রশ্ন উঠবে যে পাশ্চাত্যের লোকেরা সকলেই ধর্ম্মগুরুর (যিশুর) জীবনের আশ্চর্যজনক ঘটনায় বিশ্বাসী, সেই পাশ্চাত্যের লোকদের শিক্ষা নিয়ে এদেশের 'শিক্ষিত সম্প্রদায়' কেন ঐসব অত্যাশ্চর্য ঘটনায় অবিশ্বাসী হন?

আসলে ধর্মকে জীবিকা করেন যাঁরা তাঁদের রচিত গ্রন্থাবলী তো এদেশে যারা ধর্মকে জীবিকা করেছিলেন সেই ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় রচিত শাস্ত্র থেকে গুণ ও আঙ্গিক পৃথক হতে পারে না। কবিয়াল শ্রী হবিবর সরকারও শাস্ত্র নামক ধর্মগ্রন্থকে বলতে চান 'ধর্ম্মজগতের ইতিহাস'। মুশকিল হলো এখানেই ইতিহাস আর লীলা এক বস্তু নয়। ইতিহাস লিখতে চাই তথ্য, আর 'লীলা' রচনা করতে চাই উর্বর মস্তিস্কপ্রসূত 'আশ্চর্য কাহিনী', যে কাহিনী দ্বারা অতিসহজে অজ্ঞ ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ আকৃষ্ট হন, অথবা হয়ত প্রতারিত হন, ঠিক যে কারণে সমাজ-ইতিহাস বোধ বর্জিত অনভিজ্ঞ শিশু রূপকথা দ্বারা আকৃষ্ট হয়। বস্তুত, শিক্ষাবঞ্চিত অজ্ঞ মানুষকে শিশুর জগতে প্রতিবন্ধী করার চক্রান্ত থেকেই রূপকথার মতই এইসব 'লীলা' কথার কারবার শুরু করা হয় ধর্মব্যবসায়ীদের তরফে শোষক-শাসকের স্বার্থে।

কবিয়াল হরিবর সরকার কেন এমন উদ্ভট প্রতিবেদনাংশ তাঁর লিখিত ভুমিকায় যুক্ত করেন, যা কিনা পুস্তক রচনার ইতিহাসের সঙ্গে (যা তিনি বর্ণনা করেছেন এই ভূমিকায়) সংগতিপূর্ণ কোন উপসংহার নয়?

সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা। শ্রীহরিচাঁদ ঠাকুরের স্বজনগোষ্ঠী ও অন্যান্য অনুগামীরা তাঁর সুযোগ্য পুত্র, সমকালীন জীবনে প্রবেশের পথ-প্রদর্শক, শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে যে জীবন অভিমুখে অগ্রসরমান, সেই জীবনে প্রবেশের জন্য এই অনুগামীরা অবশ্যই পাশ্চত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন, এবং শিক্ষিত তাঁদের হতেও হবে। ফলে এইসব অনুগামীরা ঐ পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শিক্ষিত সম্প্রদায়ের' দোষে দুষ্ট হবেন, এমন আশংকা ছিল শ্রীহরিবর সরকারের। তেমন ক্ষেত্রে এই 'লীলাগ্রন্থ' নিয়ে যেসব গোস্বামীরা ধর্মকে জীবিকা করবেন, তাঁদের ভক্ত জোটানো কঠিন হবে। আর তাই শ্রীহরিবর সরকার বলতে চান পাশ্চাত্যের লোকেরা যেমন 'কেহই' 'প্রভু যীশুর জন্মজীবনী ও কার্যকলাপ' 'অত্যাশ্চর্য' ঘটনায় পূর্ণ হলেও অবিশ্বাস করে না, তেমনি হে, নবশিক্ষিত মতুয়াবৃন্দ, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত তোমরা কেউ এই গ্রন্থে বর্ণিত 'অত্যাশ্চর্য' ঘটনায় অবিশ্বাস করো না।

এমন চাপা আবেদন থাকায়, এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও অদ্যাবধি ঐ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের খপপ্‌রে পড়া লোকেদের মতই অবৈজ্ঞানিক ও ইতিহাস বিমুখ মানসিকতার শিকার। আর তাই আজও তাঁরা ইতিহাস রচনা (সার্বিকভাবে নিজেদের জীবন ও সংগ্রামকে বদলে ফেলা) থেকে দূরে, অত্যাশ্চর্য ঘটনার দিন গুনছেন— দিন গুনছেন, কবে আবার অন্য এক 'অবতার' বা অবতারের অবতার, বা তস্য তস্য অবতার 'আবির্ভুত' হবেন তাঁদের 'মুক্তি' পথ প্রদর্শন করতে। অথচ তাঁরা যদি ইতিহাস সচেতন হতেন, হতেন সমাজ সচেতন, তা হলে দেখতে পেতেন তথাকথিত হিন্দুদের অথবা অন্য যেকোন ধর্মের অবতার এই মাটির পৃথিবীতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকার কোন পথ দেখাননি, তাঁরা জীবনের পথ নয়, দেখিয়েছেন মৃত্যুর বা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের (?) পথ। অথচ হরিচাঁদ তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষদের দেখিয়েছেন জীবনে সহজভাবে বেঁচে থাকার পথ, যথার্থ জীবন-সংগ্রামের পথ। এবং কবি তারক চন্দ্র সরকারের ভাষায় এসম্পর্কে হরিচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্যও জেনে নিতে পারি

গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়। (ঐ, পৃ ২৩,২৫)

মহান হরিচাঁদই একমাত্র ব্যতিক্রমী 'অবতার' যিনি মানুষকে এই জড়জগতে গৃহীর জীবনযাপন করতে পরামর্শ দিয়েছেন, যার নির্গলিতার্থ হলো এই যে মানুষকে জড়সম্পদ সৃষ্টি করতে হবে, নিজেকে পবিত্র রেখে, অর্থাৎ অসততার পথ পরিহার করে, যা করে থাকেন শ্রমজীবী মানুষেরা।

শ্রী হরিবর সরকার অলৌলিক বা তাঁর ভাষায় 'অত্যাশ্চর্য ঘটনা' সম্পর্কে মানুষের আস্থা দাবি করেছেন। প্রশ্ন হলো, অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় যদি হরিচাঁদের গৃহী মানুষেরা বসে থাকেন তা হলে কি তাঁদের জৈবিক জীবন প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তাঁদের গৃহজীবন বজায় রাখতে পারবেন?

‘গৃহেতে থাকিয়া’ তখন ‘ভাবোদয়’ হবে তো?

এক গৃহত্যাগী সন্নাসী অন্ততঃ স্বীকার করেছেন খালি পেটে ধর্ম হয় না!

শিক্ষিত হওয়ার অর্থ তো কেবল বিদ্যালয় বা উচ্চতর শিক্ষালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান দ্বারা সমৃদ্ধ হওয়া নয়, মানুষ তার কাজের মধ্য দিয়ে সর্বদাই জ্ঞানার্জন করে, শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’ ঘটার অপেক্ষায় বসে থাকা নিরক্ষর চাষি যখন দেখবেন যে কোন অলৌকিক ঘটনার দ্বারা তাঁর ক্ষেত ফসলে ভরে উঠল না, তখন তিনি এই শিক্ষা পাবেন, যে তাঁকে শ্রমদ্বারা ফসল ফলাতে হবে। তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে এও শেখায়, যে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে না। এই শিক্ষা পাওয়ার জন্য চাষিকে কোন ‘শিক্ষিত’ সম্প্রদায়ের লোক হতে হয় না।

শ্রী সরকার জানিয়েছেন, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের সব ঘটনাবলীই নাকি ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’। কিন্তু আমরা অবাক বিস্ময়ে এও দেখি যে এই ‘অত্যাশ্চর্য ঘটনা’ সমৃদ্ধ মানুষটি হরিচাঁদের গৃহীর জীবন যাপন করতে পারেন নি। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে হরিচাঁদ-এর ভাবনার গৃহীজীবনের মৌলিক দায়িত্ব অস্বীকার করেছিলেন, তিনি মাতা ও স্ত্রীর ভরণ-পোষণের দায় অস্বীকার করেছিলেন। অথচ যে ব্রাহ্মণ্যধর্মেরও ধর্ম তথা বৈষ্ণব ধর্ম সেই ব্রাহ্মণ্য ধর্মেও কোমল রূপ এই সন্ন্যাস। স্ত্রী ও মাতার প্রতি কর্তব্য নির্দেশ আছে।

যদি শ্রী সরকার তাঁর কবিয়ালি চাতুর্য দ্বারা প্রমাণও করেন যে শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস নিয়ে সঠিক কাজ করেছিলেন, তাহলে তো তাঁকে এবং তাঁর সব অনুগামীদের সন্ন্যাস নেওয়া নৈতিকভাবে বাধ্যতামূলক। এবং সবাই যদি শ্রীচৈতন্যের পথকে বেছে নেন সেক্ষেত্রে যে মানুষদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে এই সাধু-সন্ন্যাসীরা জীবন ধারণ করেন, সেই শ্রমজীবী গৃহী মানুষের অভাবে এত আয়োজনের গাজন নষ্ট হবে! এবং একই সঙ্গে শ্রীহরিচাঁদের গৃহীর জীবনযাপনের পরামর্শকে ও উপেক্ষা করা হবে।

শ্রীহরিবর সরকারের সর্বশেষ মন্তব্য, যে শ্রীচৈতন্যের জন্ম, জীবন ও কার্যকলাপ সবটাই অত্যাশ্চর্য ঘটনাবহুল হলেও ঐসব ঘটনার ‘‘সত্যতায় কেহই সন্দিহান হয় না’’। এমন মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কেবল ঐটুকু বলাই যথেষ্ট যে কেউই যখন সন্দিহান হয় না, তখন আর পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত লোকদেরই বা তিনি ‘সন্দিহান’ হওয়া লোকদের তালিকায় কেন রাখেন? আসল কথা তো এই, যে শ্রীহরিচাঁদের জীবন ও কার্যাবলি নিয়ে কবিয়ালরা যেমন খুশি গান-গল্প বানাবেন, তাতে কারো সন্দিহান হওয়া চলবে না? অধিকন্তু, কেউ যেন ঐসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটার অপেক্ষায় নিজেদের কাজকর্মকে অবহেলা না করেন। কেননা ঐসব অত্যাশ্চর্য ঘটনা তৈরি করার মস্তিস্ক যেসব কবিয়ালের তাঁদের তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে! সম্পন্ন চাষি কবিগানের আসর না বসালে যে, কোন অত্যাশ্চর্য ঘটনায় কবিয়ালদের অন্নসংস্থান হবে না, সেকথা কবিয়ালদের চেয়ে আর বেশি কে জানেন!

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সময়ের সঙ্গে মানুষের জীবন ধারায়, জীবন ভাবনার পরিবর্তন ঘটেই চলেছে। এই পরিবর্তন ঘটে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের অভিঘাতের দ্বারা জীবন সংগ্রামের পরিবর্তন ঘটায়।

একজন যথার্থ যুগপুরুষ মানুষকে আহ্বান জানান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দ্বারা প্রভাবিত নতুন জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে এবং ঐ জীবন প্রক্রিয়ার অনুসারী জীবন ধারায় নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে।

দুঃখের বিষয়, আমাদের পুরোনো সংস্কৃতি সহজে পথ ছাড়ে না এবং সেই জীবন-সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেন তাঁরাই যারা পুরোনো জীবন ব্যবস্থায় বেশি সুবিধা ভোগ করেন? কারণ, এতে চিরায়ত বঞ্চিতরা নতুন জীবনধারায় নিজেদের উপযুক্ত করতে বিলম্ব করবেন এবং সেই অবকাশে চিরায়ত সুবিধাভোগীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নতুন জীবনকে আয়ত্ত করে নিজেদের সুবিধাজনক অবস্থানকে ধরে রাখতে সক্ষম হবেন।

মধ্যযুগ পর্যন্ত এবং এদেশে সাম্প্রতিক অতীত পর্যন্ত মানুষের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা হেতু পরস্পর সম্পর্কে মানুষ যেমন অজ্ঞ থেকেছে, তেমনি ঐ অজ্ঞতার শূন্যস্থানে সাধু-সন্ন্যাসী-গোসাঁইদের প্রচারের দ্বারা নানা তথাকথিত অত্যাশ্চর্য বা অলৌলিক ঘটনা স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু এখন পৃথিবী খুব ছোট হয়ে গেছে, মানুষ পরস্পরের অনেক কাছাকাছি এসে গেছে। তাই সব ঘটনা তার বাস্তব চেহারা নিয়েই মানুষের নিকট, প্রশ্ন উত্থাপনকারী মানুষের নিকট উপস্থিত হয় এবং অতঃএব ঐ বাস্তব ঘটনার শরীরে কোন অত্যাশ্চর্য বা অলৌকিক ছাপ থাকতে দেখা যায় না।

ইতিহাস বলে, ধর্মগুরুদের নানা ‘অত্যাশ্চর্য’ কর্মকান্ড তাঁদের অনুরাগী শিষ্যদের মস্তিষ্ক প্রসূত কল্প কথা মাত্র। আসলে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনাই যুক্তির মাপকাঠির বাইরের কিছু নয়। হতে পারে ঐসব ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার মত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য মানুষের করায়ত্ত সর্বদা থাকে না; কিন্তু তাই বলে ঘটনা কখনই ‘অত্যাশ্চর্য’ কিছু নয়, যদি অবশ্য ঘটনাটি সত্যিই ঘটে থাকে। একথা থেকে অবশ্য এমন সিদ্ধান্ত সঠিক নয়, যে যা কিছু যুক্তি সম্মত তাই বাস্তব। কেন না যুক্তির মার প্যাঁচে অনেক অবাস্তবকে বাস্তব এবং অনেক বাস্তবকে অবাস্তব প্রমাণ করে দিতে পারেন তর্কবাগীশরা। যুক্তিকে অবশ্যই তথ্য ও তত্ত্ব নিষ্ঠ হতে হবে।

শিষ্য বা অনুরাগীদের তরফে গুরুদের সম্পর্কে নানা তথাকথিত ‘অত্যাশ্চর্য’ ঘটনা যে সরবরাহ করা হয় তেমন ইঙ্গিত আমরা শ্রীহরিবর সরকার কর্তৃক লিখিত পরিশিষ্ট (পৃ.২৮) থেকেও পেতে পারি। তিনি জানাচ্ছেন

‘‘আমি বোধকরি, প্রভুর আজীবন লীলার কণাংশ মাত্রও এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল না। ... কিন্তু তাঁহার অনুষঙ্গ ভক্ত বা প্রাচীনতম ব্যক্তি বা তাহাদের বংশধরগণের প্রমুখাৎ যাহা শ্রুত হওয়ায় তাহা সংগ্রহ করিতে পারিলে এরূপ অনেকানেক গ্রন্থ হইতে পারে।’’

হ্যাঁ, এভাবেই বিচ্ছিন্ন মানুষের মধ্যে নানা কল্পকাহিনী তাদের গুরু সম্পর্কে ভক্তদের

দ্বারা প্রচারিত হয় এবং একসময় গুরু হয়ে ওঠেন কোথায়ও ঈশ্বর পুত্র, কোথায়ও পয়গম্বর, কোথায়ও বা অবতার। আর গ্রন্থাগার যদি হন ব্রাহ্মণ্য ভাবধারায় প্রভাবিত, তা হলে কোন জননেতাকে কেবল ধর্মগুরু বানাবেন না, তাকে বানাবেন স্বয়ং তথাকথিত ঈশ্বর বা তার অবতার। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'-এর লেখক শ্রীসরকার তাই নিঃসন্দেহে এক ব্রাহ্মণ্যতন্দ্রাশ্রিত মানুষ। তাঁর আত্মপরিচয় থেকেও একথা আমরা জানতে পারি। 'গ্রন্থকারের বিনতি' নামক শিরোনামের অংশে তিনি শুরু করেছেন এভাবে

গোস্বামীর অনুমতি, বন্দি মাতা সরস্বতী,
মূঢ়মতি আমি অভাজন।
শক্তিময় দিয়া শক্তি, আমাদ্বারা কর উক্তি,
পঞ্চাশ বর্ণ স্বর ব্যঞ্জন।।
.....
লেখে যদি শূলপানি, বাণী যদি বলে বাণী,
তবু বাণী অবধি না হয়।
আমি যে সাহস করি লিখিতে কলম ধরি
সাধু গুরু বৈষ্ণব কৃপায়।। (ঐ, পৃ.৮)

শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম যে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রেরই এক কোমল রূপ, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বেঁচে থাকার এক ঐতিহাসিক বাধ্যবাধকতা, আচন্ডাল যবনকে কোল দেওয়ার ব্রাহ্মণ্য কৌলশ, সে তো স্পষ্ট হয় স্বয়ং শ্রীচৈতন্যের ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে ফিরে যাওয়ার মধ্যে। কেবল এটুকুই কবির দার্শনিক পরিচিতি নয়। তিনি যে আপাদমস্তক হরিচাঁদের ভাবনা বিরোধী ব্রাহ্মণ্য ভাবধারার লোক, সে পরিচয় ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'গ্রন্থকারের বিনতি' নামক ভনিতায়। আর আমরা হরিচাঁদকে খুঁজে পেতে চাইছি সেই গ্রন্থে যার লেখক স্বয়ং হরিচাঁদের দর্শন–বিরোদী ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের পদাশ্রিত। এই হরিচাঁদ-দর্শন বিরোধী কবির দাবি শোনা যাক

লিখি লীলা গুহ্য বাহ্য গ্রন্থকার মনোধার্য্য
পূজ্য হোক্ ভক্ত সমাজেতে।। (পৃ.৮)

তাহলে দেখা যাচ্ছে তারক কবি তাঁর 'লীলাগ্রন্থে' কবির নিজের 'মনোধার্য্য' অর্থাৎ খুশিমত গোপন ও প্রকাশ্য লীলা তিনি রচনা করেছেন। অর্থাৎ, কবি আমাদের কার্যত জানিয়ে দিলেন, এই গ্রন্থের 'অত্যাশ্চর্য' ঘটনাবলী আসলে তাঁর 'মনোধার্য্য' বা ইচ্ছামত বানানো ঘটনা। তিনি অবশ্য তাঁর এই যাখুশি 'মনোধার্য্য' ঘটনা-সমৃদ্ধ গ্রন্থকে ভক্ত সমাজে 'পূজ্য' হতে দাবি জানাচ্ছেন। হ্যাঁ, ভক্ত সমাজে এমন দাবি চলে এবং তা মান্যতাও পায়। কেন না, ভক্ত যিনি, তিনি প্রশ্নহীন, আত্মসমর্পিত। তাই তাঁর কাছে তাঁর গুরু বা 'ঈশ্বর' বা 'অবতার' সম্পর্কে সমস্ত অত্যাশ্চার্য ঘটনাই গ্রহণযোগ্য এবং অতঃপর, 'পূজ্য'।

আরো লক্ষ করা যেতে পারে যে এই কবি এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রের ও পৌরাণিক কাহিনীর অনুকরণে উপস্থাপিত করতে চান। তিনি তাঁর পাঠকদের জানাচ্ছেন"

বেদব্যাস মহামুনি, যত লিখিলেন তিনি
চারি বেদ আঠার পুরাণ। (পৃ.৮)

ইত্যাদি। কীভাবে সক্ষম হলেন ব্যাস ঐই সব গ্রন্থ লিখতে?

একদা বদ্রিকাশ্রমে, ব্যাস মুনি ছিল ঘুমে
হেন কালে আসি দুই পাখি।
.....
শাখে বসি দুই সুকে একটি কহিছে সুখে
অবিরত 'ত্রয়োস্ত্রিংশৎ'।
অন্যটির মুখে বাণী, শুনিতেছে ব্যাসমুনি,
উঠে ধ্বনি 'পঞ্চপঞ্চাশৎ'।। (পৃ.৮)

অতঃপর ব্যাস ধ্যানযোগে জানলেন যে, যে-পাখি সংস্কৃত বলছে, সে হলো বাল্মীকি। এরপর,

ব্যাস কহে শুকপাখি, আমি যে ভারত লিখি,
বৈকুণ্ঠপতির সব লীলা,
বাসুদেব যদুবংশ, কৃষ্ণ নারায়ণ অংশ
লিখি তাঁর ঐশর্য্যের খেলা।। (পৃ.৯)
..... ইত্যাদি।

এইরূপে কবি তারক রামায়ণ-মহাভারত রচনার কল্পকাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ উপস্থাপিত করার পর 'হরিলীলা' বর্ণনা করতে চান। অর্থাৎ কবি তারক সরকার মহান এক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র রচনার কল্পকাহিনী অনুসরণ করার কথা ঘোষণা করেন

সেই মত লিখি পুঁথি হরিচাঁদ লীলাগীতি
রামকার্য্যে মার্জারের ন্যায়। (পৃ.১১)

স্বাভাবিক ভাবেই এমন গ্রন্থ থেকে সেই বাস্তব জীবনে পথ চলার কোন দিক-নির্দেশ পাওয়া যাবে না, যে-বাস্তব গৃহীজীবনকে অনুসরণ করতে হরিচাঁদ তাঁর স্ব-জনগোষ্ঠীকে আহ্বান জানিয়েছেন। তথাকথিত ধর্মপ্রাণ মানুষ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে পার্থিব জগতে চলার পথ অনুসন্ধান করেন না, তাঁরা কেবল 'পুণ্যার্জনের' জন্য ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন। 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত' রচনা পদ্ধতি যেহেতু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধর্মশাস্ত্র রচনাকে অনুসরণ করেছে, তাই এই গ্রন্থ হরিচাঁদের জীবনী না হয়ে, হয়েছে 'ধর্মগ্রন্থ' যা পাঠ করলে ভক্ত ভাবতে পারেন যে তিনি 'পুণ্য' সঞ্চয় করলেন। কিন্তু এই গ্রন্থ থেকে হরিচাঁদ-এর নির্দেশিত পথ সরাসরি খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই পাওয়া যাবে না গৃহীজীবন যাপনে সাফল্য অর্জনের উপায়!

এই সিদ্ধান্ত থেকে একথা বলাই যায়, কবি তারক ও তাঁর প্রেরণাদাতা গোস্বামীরা মহান হরিচাঁদের প্রতি, তাঁর স্ব-জনগোষ্ঠীর প্রতি এক অমার্জনীয় অপরাধ করেছেন, তিনি হরিচাঁদকে

ব্যবহার করেছেন তাঁর জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দাসত্বে অবনত করতে। এমন ঘটনা যাতে না ঘটে, যাতে তাঁর জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাঁর জীবন থেকে বাস্তব জীবন সংগ্রামের পথনির্দেশ পেতে পারেন, ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক 'পুণ্য সঞ্চয়' নামক কুশিক্ষার শিকার না হন, সেইজন্য শ্রী হরিচাঁদ এই গ্রন্থ প্রকাশ নিষেধ করেছিলেন। তাঁর নিষেধকে অমান্য করে এই গোস্বামীরা হরিচাঁদের প্রতি যেমন বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী, তেমনি তাঁরা হরিচাঁদের জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির পথ, উন্নত জীবনযাপনের পথ থেকেও দিক্‌ভ্রষ্ট করেছেন। এই জনগোষ্ঠী সহ সারা ভারতের শ্রমজীবী জনমানুষ ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা যে মানবেতর সামাজিক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন তার থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে তিনি ব্রাহ্মণ্য বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করার আন্দোলন শুরু করেন। স্বয়ং কবি তারকই জানাচ্ছেন

ব্রাহ্মণেরে মান্য দিল নিজ ভগবান
কি সাহসে হরিদাস করে অপমান।

এই ছিল হরিচাঁদ (তখনও হরিদাস বিশ্বাস) ঠাকুর সম্পর্কে ব্রাহ্মণের প্রতিক্রিয়া। তাঁদের আরো প্রতিক্রিয়া ছিল

বেদবিধি নাহি মানে না মানে ব্রাহ্মণ।
নিশ্চয় করিতে হবে এদলে শাসন।। (পৃ.৯৪)

এবং ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের প্রতিনিধিদের সম্পর্কে হরিচাঁদের মূল্যায়ণ ছিল

কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থ বশে অর্থলোভী যত ভন্ড সব।। (পৃ.৯৪)

এই হলো ব্রাহ্মণ তথা ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র অর্থাৎ তথাকথিত হিন্দুধর্ম সম্পর্কে শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের মূল্যায়ণ। অথচ তারক গোসাঁই, সম্ভবত অন্যান্য গোসাঁইদের প্ররোচনায়, হরিচাঁদের বার্তাকে করালেন সেই ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পিত। এভাবেই নমো ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা নিপীড়িত অন্যান্য শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রা হরিচাঁদের কালোপযোগী বার্তা থেকে বঞ্চিত হলো এবং ঐসব মানুষেরা র'য়ে গেলেন ব্রাহ্মণ্য সামন্ততন্ত্রের সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণায় মোহাচ্ছন্ন এবং অতঃপর তাঁরা রয়ে গেলেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সুবিধাভোগীদের নিকট ঘৃণ্য, রয়ে গেলেন তাদের পদাশ্রিত।

পিতৃ-সংসর্গ হেতু মহান গুরুচাঁদ ঠাকুর তাঁর জনগোষ্ঠীর সমকালীন জীবনের প্রয়োজনীয় অভিমুখিতা বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই জনগোষ্ঠী কিছুটা হলেও তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে। গুরুচাঁদের শিক্ষা আন্দোলন সেই পথ-নির্দেশেরই ফলশ্রুতি। অপরদিকে পরবর্তী ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ধারা অনুসরণ করে ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক ধর্মব্যবসায়ে লিপ্ত। এই পথে তাঁদের অনুপ্রেরণা হলো কবিয়াল শ্রী তারক চন্দ্র সরকারের 'শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত'।

গ্রামবাংলার জাগরণে মতুয়া আন্দোলন

সমুদ্র বিশ্বাস

হরিচাঁদ ঠাকুরের জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যু ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ১২৫ বছরের মতুয়া আন্দোলন বৃহৎ বাংলার সবচেয়ে শক্তিশালী গণসংগ্রাম। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত অগ্রদূত হরিচাঁদ ঠাকুর। আর মতুয়ারা নবজাগরণের সংগ্রামী বার্তা বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার দায়ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল বস্তুবাদী মানবিক মতুয়াদের এই আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় স্থান পেল না কেন? মতুয়া আন্দোলনের এই 'চেপে রাখা ইতিহাস' যত প্রকাশ্যে আসছে ততই পাঠক-শ্রোতা সত্য-মিথ্যার দোলাচলে ভুগতে থাকেন। তথ্য সূত্র খুঁজতে থাকেন। কিন্তু কোথায় পাবেন তথ্যসূত্র। শাসক-শোষক শ্রেনীর আশ্রিত লেখক পন্ডিতেরা তাঁর প্রভুর বিদ্রোহী শক্তি অর্থাৎ চেপে রাখা প্রতিবাদী কৃষি সমাজ, মুটে-মজুরদের আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার সংগ্রাম কি লিখবেন? না, লিখবেন না। লেখেনও নি। যা লিখেছেন তার বেশিরভাগটা বিকৃত। প্রাচীন ভারতের ঋষিরা ইতিহাসের উপাদান নিয়ে বেদ্, রামায়ণ, মহাভারত রচনা করেছেন। বহু পুরাণ (Mythology) রচনা করেছেন। ইতিহাস রচনা করেননি। ফলে, ভ্রাম্যমান যাযাবর (নর্ডিক) আর্যদস্যু ও তাদের উত্তরসুরী ব্রাহ্মণ্যবাদী চোখে উৎপাদনশীল শ্রমজীবী মানুষ দাস-দস্যু, রাক্ষস-খোক্কস, দত্যি-দানো নামে পরিচিতি পেয়েছে। মুসলমান রাজত্বে ইতিহাসের হাতেখড়ি হলেও তা বড্ড একপেশে। ইংরেজ শাসনে ইতিহাস চর্চার খোল নলচে গেল বদলে। ইতিহাস যা দাড়ালো তা হলো ব্রিটিশ শাসনের জয়গান। জনগনের ইতিহাস কোথায়? নেই। কোথাও নেই। যেটুকু ছিটে-ফোটা আছে তা অনেকটা হকার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্টের মতো। যে কোন দিন হকার ছিলেন না। আগামী একশো বছরে তার বংশের কারো প্রয়োজন হবে না হকারি করার। তিনি একটি শ্রমবিমুখ জাতিতে জন্মেছেন। শাসকের দালালি ও দাসত্ব ভালো বোঝেন। বোঝেন ভালো ভালো মানবতাবাদী বুলি ঝাড়তে। সঙ্গে আছে ছল-চাতুরি শিক্ষার সার্টিফিকেট। সেরা সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা সেরা নম্বর লেখা আছে তাতে। কাজে কাজেই তিনি পন্ডিত। আর পন্ডিত সর্বত্র পুজ্যত্বে। ব্যস্ তিনি মহাপুরুষ। ভালো ভালো মানবতাবাদের বুলি বা বাণী দেবেন। স্বর্গ–নরক বোঝাবেন। শিল্প করবেন, সাহিত্য করবেন। কৃষকের, জেলে, শ্রমিকদের কি করলে ভালো হবে তার পথ বাতলাবেন। আর সেই পথে সকলকে চলতেও হবে। প্রয়োজনে শাসনের যাঁতাকলে শোষণ ও প্রহসন করবেন। ফল কি? তাঁতির মেয়ের গায়ের শাড়ী থাকবে ছেঁড়া, জেলে পাতে থাকবে না মাছ, কৃষকের ভাতে থাকবে কাঁকড়। আর পন্ডিত শিক্ষিত বাবুর ছেলেমেয়েরা খাবে টাট্‌কা সবজী, গোবিন্দভোগ চাল, কাঁটালি কলা, ইলিশ-রুই-কাতলা, গলদা-বাগদা, কাঁকড়া-কচ্ছপ। একজন কৃষক বা শ্রমিকের সন্তানকে জলে পাঠালে মাছ ধরে দেখাবে। জমিতে পাঠালে ফসল ফলিয়ে দেখাবে। বিদ্যা শিক্ষার জন্য নুন্যতম পরিবেশ দিলে স্কুলের সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় স্থান করে দেখাবে। আর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর 'বাবু'দের সন্তানদের প্রশ্ন চুরি করে দিলে কিংবা প্রতিটি Subject এ দু-তিনটে করে টিচার দিলে ক্লাসের First Boy হলেও হতে পারে। কিন্তু বাকি দুটোতে ঠুঁটো জগন্নাথ মানে অকর্মের ঢেঁকি। অথচ এই বাবুর ছেলেই বাবু হয়ে বুদ্ধিজীবী তক্‌মা নিয়ে প্রাণহীন শিল্প করবেন। পুরস্কার পাবেন, বাহবা কুড়োবেন। আর তার রচনা বা কাহিনী গদগদ হয়ে মুখস্থ করবে কৃষিজীবী শ্রমজীবী মানুষের সন্তান। ঠিকঠিক তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির পঠন-পাঠন করতে না পারলে 'সংরক্ষণ' নামক গালি খাবেন। S.C. অর্থাৎ সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছেন। এদের দাসত্ব করবার আলাদা জায়গা ছেড়ে দাও। আর নাক সিটকিয়ে বলো— ব্যাটা SC, ST। এভাবে এগিয়ে চলবে বর্ণবাদী শিক্ষা ও ইতিহাস চর্চা। আর এই কারনেই গরীব দুখি জনসাধারণের ইতিহাসের উপাদান পন্ডিতি চর্চায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে কৃষক জনসাধারণের নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের ইতিহাসকে আড়াল ও বিকৃত করে ভারতবর্ষের নামে, কেবল নগন্যসংখ্যক শোষক গোষ্টীর ইতিহাস ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রচনা করা হয়েছে। আর এই মেদযুক্ত উপকাহিনীমূলক ইতিহাসকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে চালানো হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসক ও স্থানীয় শোষকদের অনুসরণকারী দেশির ঐতিহাসিকদের লেখা বিকৃত ইতিহাসে ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষের প্রকৃত পরিচয় ঢাকা পড়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ইতিহাসি' প্রবন্ধে লিখেছেন, ''দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। মামুদ-এর আক্রমন হইতে লর্ড কার্জনের সাম্রাজ্য গর্বোদ্গার কাল পর্যন্ত যাহা কিছু ইতিহাস কথা তাহা ভারতবর্ষের পক্ষে বিচিত্র কুহেলিকা, তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।"

ঐতিহাসিকদের মনে রাখা উচিৎ, যারা সুদূর অতীতকাল থেকে বংশপরম্পরায় জমি ভোগদখল করে আসছেন; ফসল ফলিয়ে সন্তানাদি ভরণ-পোষণ করছেন; সমাজ ও সভ্যতার ধারক–বাহকের কাজ করছেন; হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই বিনা অপরাধে ও বিনা কারণে কিছু ধড়িবাজ মানুষ রাষ্ট্রের ভয় দেখিয়ে, কিসব আইন প্রনয়ণ করে তাদের জমির ভোগ দখল কেড়ে নিল। কৃষক শ্রমিক হয়ে পড়ল দাস বা প্রজা বা ভাগিদারী চাষা। কিংবা সকল সম্পত্তির উপর এমন বেশি পরিমানে রাজস্ব চাপানো হল যা দেওয়ার ক্ষমতা ওই কৃষক-শ্রমিকের নেই। আর সরকার জমিদার মহাজনের কাছে আবেদন নিবেদন করেও কোন ফল হয় না। তখন ওই কৃষক-শ্রমিক তাঁর জমি-সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেবেন, সশস্ত্র সংগ্রাম করবেন; এটাই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের গবেষণা হাতে এসেছে। তাঁরা সংগ্রামী কৃষকদের দাঙ্গাকারী জনতা, উচ্ছৃঙ্খল জনতা, বংশ পরম্পরায় দাঙ্গাপ্রবণ, ইতরজন, ডাকাত, লুন্ঠনকারী, খুনি প্রভৃতি নামে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ আবার সাধ করে তাঁর গ্রন্থের নাম লিখেছেন, 'Civil Disturbances' । বা এ জাতীয় অসম্মানকর। ফলে, মতুয়াদের গর্বের ইতিহাস পাওয়া দুষ্কর। অপমান ও অসম্মানসূচক বাক্য পড়তে পড়তে একসময়ে এই সকল কৃষি সমাজ ভাবতে ভুলে যায় যে তারা না থাকলে সভ্যতা অচল হয়ে পড়ে। রাজা মহারাজা, মন্ত্রী-এম.এল.এ., এম.পি. ও ধনী ব্যবসায়ীদের কেরামতি সাজে না। ধনিক শ্রেণির পেটে অন্ন জোটে না। মতুয়া আন্দোলনের স্বরূপ সন্ধান করতে গেলে তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির উপর চোখ রাখতে হবে। যতই চেপে রাখার বা ঢেকে রাখার চেষ্টা হোক না কেন মতুয়ারা অর্থাৎ নমজাতি তাদের অস্তিত্বের স্বীকার করাতে বাধ্য করেছেন। ঋক্‌বেদে, পুরাণে, বৈদেশিক পর্যটক, বৌদ্ধধর্ম কথা, মুসলিম ও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার নথিপত্রে তার যথেষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বঙ্গদেশ দখল করার পর বস্ত্র, রেশম ও লবণ শিল্প ব্রিটিশ বণিকদের হাতে চলে যায়। সুদূর অতীতকালে নমরা এবং এ সময়ে নমজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষেরা বস্ত্র ও রেশম শিল্পের মূল কারিগর। অবশ্য লবণশিল্প তখনও স্বনামে নমরাই ধরে

রেখেছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকে নমরা সমুদ্রের জল রৌদ্রে শুকিয়ে লবণ তৈরী করতো। বঙ্গদেশে লবণ তৈরীর প্রধান কেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, খুলনা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি, মোংলার্ট, চট্টগ্রাম অঞ্চল সমূহ। লবণ তৈরীর বেশিরভাগ অঞ্চলগুলি 'নমপাড়া' নামে পরিচিত ছিল। ততদিনে নমদের চন্ডাল বা চাড়াল বলে গালি দেওয়ার ফলে নমপাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চাড়াল পাড়াও বলা হতো। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রাধান্য পালযুগের বৌদ্ধধর্ম নমদের চন্ডাল বা চাড়াল বলে আখ্যায়িত করে। কারণ, পালরাজাদের ভিত্তি গড়ে নমরা গোপাল কে সিংহাসনে বসিয়ে। Calcutta Review, N.K. Sinha-র Midnapur Salt Papers, J.C. Sinha-র Economic Annals of bengal, Henry Beveridge-এর History of Bakharganj প্রভৃতি গ্রন্থে এর যথেস্ট উল্লেখ রয়েছে।

সুদূর অতীতকালে নমরা দুটি ভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সংকর ঘটিয়ে পাট গাছের জন্ম দেন। এক সময় পাটজাত দ্রব্য দেশ-বিদেশে রপ্তানী হতো। এই পাট আবিষ্কার নমদের। আয়ুর্বেদ চর্চা প্রায় কম বেশি সকল সমাজ ব্যবস্থায় চালু ছিল। সব চাইতে বেশি গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী করতেন ভারত সভ্যতার গ্রাম্য সমাজ। নমজাতি তার মধ্যে অন্যতম। নমদের নিজস্ব উন্নত চিকিৎসা বিদ্যা ছিল। তার নাম চাঁদনী চিকিৎসা। বর্তমান সরকারী অবহেলায় এই চিকিৎসা পদ্ধতি হ্রাস পেয়েছে। সমাজ সচেতন করার জন্য যেমন সাম্যবাদী দর্শন ছিল তেমনি সেই দর্শনকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য 'গ্রাম সভা' ছিল। গ্রামসভা বা হাট কমিটির পরিচালনায় কবিগান ছিল। ছিল ভাটিয়ালী। সারি-জারি প্রভৃতি। বিজয় উৎসব ছিল নৌকাবাইচ। জলদস্যু বা স্থলদস্যুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য সবাইকে সজাগ ও সংকেতদেওয়ার মাধ্যমে ছিল জয়ডঙ্কা। জয়ডঙ্কা বাজানো মানে শত্রু আক্রমন করতে আসছে সকলে তৈরী হও। বিজয়ী হতে হবে। নমদের কাট, ঘাস, খড়, আর হোগলা পাতা দিয়ে ঘর বানানো এক কথায় অসাধারণ। নমদের নৌকা বানানোর জুড়ি মেলা ভার। নমদের ধান চাষ, দশ-পনেরো হাত জলের নিচে ধান লাগানো, ৪২২ রকম ধান আবিষ্কার পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। প্রকৃতপক্ষে, নমজাতি উৎপাদক শ্রেণীর। ফলে, তাঁদের সমাজ সংসারে যা যা প্রয়োজন তা তারা নিজেরাই সংগ্রহ করে নিতে পারে। কারো ওপর নির্ভর করতে হয় না। তার ওপর সমবন্টনে বিশ্বাসী। আর এই কারণে রাষ্ট্র ও বাজার, শাসন ও শোষনের দরকার হয়নি। আর তাই অনায়াসে গোপালকে ধরে এনে সিংহাসনে বসিয়ে দিতে পারেন। B.M. Funt-এর 'Pual Revolution in East India এবং শোভন সুন্দর বাগচীর 'পাল যুগের সমাজ' বই দুটিতে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। মূলতঃ রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকার ফলে সভ্যতা গড়ার কারিগর নমজাতি নানান সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ক্রমে ক্রমে একটা বড় অংশের নমদের কুসংস্কার ও ধর্মীয় মৌলবাদ গ্রাস করে। অজ্ঞানের অন্ধকারে পড়ে থাকা প্রান্ত মানুষজনকে আলোর পথ দেখান নম মতাদর্শের ধারক বাহক স্বয়ং হরিচাঁদ ঠাকুর।

বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার সফলা ডাঙ্গা গ্রামে ১৮১২ সালের ১১ মার্চ হরিচাঁদ ঠাকুর জন্মগ্রহন করেন। হরিচাঁদের প্রকৃত নাম হরিদাস বিশ্বাস। সাম্যবাদী দর্শনের চোখে গরীব দুঃখি কৃষক মানুষজনের মনের অন্ধকার দূর করতেন বলে আপনজনেরা তাঁকে ঠাকুর বলে সম্বোধন করতেন। চাঁদের মিষ্টি জোৎস্না পৃথিবীকে সুন্দর মোহময় করে তোলে তেমনি হরিদাসের মানবপ্রীতিতে বাংলার কৃষিজীবীদের জীবন আলোকময় হয়ে ওঠে। ফলে, সাধারণ মানুষ ভালোবেসে হরিদাসকে চরিচাঁন বলে ডাকতেন। চান্ কথাটি চাঁদ কথার গ্রাম্য উচ্চারণ। যশোবন্ত বিশ্বাস ও অন্নপূর্ণা বিশ্বাস, সেই কৃষক দম্পতির পাঁচ সন্তানের মধ্যে হরিচাঁদ দ্বিতীয় ছিলেন। অন্য চার সন্তানের নাম কৃষ্ণদাস, বৈষ্ণবদাস, স্বরূপদাস ও গৌরিদাস। যশোবন্ত বিশ্বাস বৈষ্ণবধর্মে গভীর অনুরাগী ছিলেন বলে সকলে তাকে যশোবন্ত বৈরাগী বলে সম্বোধন করতেন।

বৃহৎবঙ্গের জঙ্গল অর্থাৎ বাদাবন কেটে জনবসতি গড়ে তুলেছিলেন নমজাতির মানুষেরা। সেই সুদূর অতীতকাল থেকে কৃষি ও কুটির শিল্পের দক্ষতার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছিলেন পান্ডুরাজার রাজধানীর মতো নগর-বন্দর। পৃথিবীর বিভিন্নদেশে তাঁদের সম্পদ সৃষ্টি ও বিপননের সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এরপর নানান ঘাত-প্রতিঘাত আর উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে কয়েক হাজার বছর। নমরা স্বনামে তাঁদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাদের জীবন সংগ্রামের মধ্যে ওতোপ্রতভাবে জড়িত বাস্তববাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে উনিশ শতকে মতুয়া আন্দোলন গড়ে ওঠে। দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পেষনে বাংলার শ্রমজীবী সমাজের মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করতে থাকে। জাতপাত, ঘৃণা-বিদ্বেষ আর বিভ্রান্তি মূলক অপধর্ম গোটা বাঙালি জাতিকে গ্রাস করে ফেলে। বিড়ালে রাস্তাকাটা, একশালিক বা দুইশালিক দেখা গ্রাম্য বা স্বল্প শিক্ষিত মানুষদের কুসংস্কার হলেও গণেশের মূর্তিকে দুধ খাওয়ানো, পাড়ায় পাড়ায় বা ষ্টেশন চত্বরে শনি পূজো দেওয়া প্রভৃতি শিক্ষিত মধ্যবিত্তের কুসংস্কার ভুরিভুরি দেখা যায়। এইসব অপশিক্ষা আর টোল পন্ডিতদের জাতি বিদ্বেষ, পুরোহিত শ্রেনীর নীতিকথা, তুক্তাক্, পুজো-পার্বনের খপ্পরে পড়ে বঙ্গের প্রতিবাদী গরীব কৃষক সমাজ ন্যুব্জ হয়ে পড়ে। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া আন্দোলনের মধ্য সিয়ে নুঁইয়ে পড়া গ্রামীন কৃষক-কারিগররা মাথা উঁচু করে বাঁচতে শেখেন। বাংলার সম্পদ সংগ্রহকারী, সম্পদ উৎপাদনকারী ও সংগৃহীত সম্পদের সমবন্টনে বিশ্বাসী নমদের ভ্রাতৃসুলভ বাস্তব সম্মত একটি চলমান দর্শন, আদর্শ বা মতাদর্শ ছিল। ত্রয়োদশ-চর্তুদশশতাব্দীর লেখা 'শূণ্যপুরাণ'-এ রামাই পন্ডিত লিখেছেন– 'গাইল পন্ডিত রাম নম সপ্তসার'। যা নমদের 'সপ্তনীতি' নামে পরিচিত।সে সময়ে নমরা যে আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় মর্যাদার আসনে ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখে না। 'শূণ্যপূরাণ' বলছে —

নমসব পড়াল পন্ডিত চারিজন।
পন্ডিতে দক্ষিণা দিল রজত কাঞ্চন।।

নমজাতির এই প্রবহমান 'সপ্তনীতি'কে পাথেয় করে হরিচাঁদ ঠাকুর একটি গণআন্দোলনের রূপ দেন যা 'মতুয়ামত' নামে পরিচিত। আদর্শগত ও উদ্দেশ্যগতভাবে 'মতুয়ামত', মতুয়া মতাদর্শ বা মতুয়া আন্দোলন সমার্থক। 'মতুয়াধর্ম' শব্দটি একটি প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের (Religion) রূপ নিয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তন স্বাস্থ্যপ্রদ নয়। অন্ধ-গোঁড়া মানসিকতার প্রভাব পড়তে পারে। ব্রাহ্মণ্যপ্রভাবমুক্ত থাকাই নমদের জীবন দর্শনের মধ্যে অন্যতম। বঙ্গদেশের অন্যান্য ধর্মের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। কারণ, এরা জন্মান্তর, পাপ–পূণ্য, ভগবান-শয়তান কিছুই মানে না; বিশ্বাসও করে না। হরিলীলামৃত বলছে— ''পূণ্যকে যে দেয় না স্থান, পাপ কোন ছার। তারা মানবতাবাদে বিশ্বাসী। বিপদগ্রস্ত অসহায় মানুষদের শক্তি-সাহস ও ভালোবাসা দিয়ে পাশে থাকা তাদের জীবন শিক্ষা ও কর্তব্য বলে মনে করে। সেইজন্য এ জাতিকে পাপ-পুণ্য বোধ কাজ করে না। ব্রাহ্মণ্যধর্মসহ অন্যান্য রাজশক্তির আশ্রিত ধর্ম এই সমাজে পাপ পুণ্যবোধ ঢুকিয়েছে। বুদ্ধিমান নয়, চালাক-চতুর

ও ভন্ড ধড়িবাজ বানানোর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করেছে। তা না হলে, এ সমাজ এত পুজোপাঠ প্রিয় হয়ে পড়ত না। এতটা ব্যক্তিস্বার্থপর হয়ে উঠত না। বিশেষ করে যারা মন্ডল থেকে মুখার্জী, মিস্ত্রি থেকে মিত্র, সাম্যবাদী মনোভাবের বদলে ব্যক্তি বা তার পরিবারের বিশেষ মানুষজনের কল্যাণ কামনায় মিথ্যা, জালিয়াতি, ঘুসের আশ্রয় নেয়। জুয়াখেলা, মদখাওয়া, নারীকে অসম্মান করা এ জাতির জীবনে ছিল না। পৃথিবীর সেরা জুয়াড়ি মহাভারতের যুধিষ্ঠির। যে কিনা নিজের সহোদর ভাইদের পাশাপাশি স্ত্রী দ্রোপদীকে পর্যন্ত বাজিধরে। নারীর এতবড় অসম্মান পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। রামায়ণের রামচন্দ্রের সীতা পরিত্যাগ মানব জাতির কলঙ্কজনক ঘটনা। আর এসব বাঙালি সমাজে প্রবেশ করেছে। এসবই আর্য সংস্কৃতি বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের ফসল। বঙ্গদেশের গারো বিদ্রোহ বা পাগলপন্থী বিদ্রোহ, ওয়াহাবী বিদ্রোহ, ফরাজী বিদ্রোহ নমজাতির অংশগ্রহণ থাকলেও তা ধর্মের কারণে নয়, তা জমিদার-তালুকদার-মহাজন গোষ্ঠীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য।

অনেকে প্রশ্ন করেন হরিচাঁদ ঠাকুর মৈথিলি ব্রাহ্মণ ছিলেন কিনা? না। হরিচাঁদ ঠাকুরের পূর্বপুরুষেরা ধড়িবাজ ব্রাহ্মণ্যবংশের ছিলেন, তেমন কোন তথ্যসূত্র পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্রীহরিলীলামৃতের আদি সংস্করণে এ ধরনের কোন উল্লেখ নেই। রাঢ় দেশ থেকে ঘুরতে ঘুরতে লক্ষীপাশা হয়ে সফলাডাঙ্গা-ওড়াকান্দিতে তাঁদের বসবাস। নিজেদের ব্রাহ্মণ বংশজাত এইরোগ এক সময় গোটা পিছিয়ে পড়া এবং পিছিয়ে রাখা সমাজের মনে বাসা বেঁধে ছিল। মুসলিম শাসনে বাঙালি ব্রাহ্মণ সমাজ সম্মানের সঙ্গে জীবনযাপন করতে পারতো। রাজকার্যে মন্ত্রণাদাতা হিসাবেব চাকরি করতেন। শূদ্র কায়স্থরা ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি করে। সমাজে সম্মান পেতে শুরু করে। ব্রিটিশ রাজত্বে —শূদ্ররা 'কায়স্থ নামে পুরোপুরি ব্রাহ্মণদের দলভুক্ত হয়। তবে ব্রাহ্মণ-বদ্যির পরে তাদের সামাজিক মর্যাদা। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বঙ্গের প্রায় সকল জল-চল, জল-অচল সম্প্রদায় অবশ্যই ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও মত অনুযায়ী অস্পৃশ্য, অতি অস্পৃশ্য সকলেই ব্রাহ্মণ-বদ্যি-ক্ষত্রিয় মর্যাদা পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি করেন। নমরা এর ব্যতিক্রম নয়। ইতিমধ্যে তাদের ওপর আরোপিত চন্ডাল বা চাড়াল গালি মোচন সংগ্রাম শুরু হয়েছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্য জাতিবাদী অত্যাচার-অসম্মান অন্যদিকে মুসলিম মানুষজনের সঙ্গে ক্রমাগত দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়া নমসমাজকে জর্জরিত করে তোলে। তাঁদের এক অংশের মানুষ ব্রাহ্মণ্যত্ব দাবি করেন। একটি বড় অংশ তার বিরোধিতা করেন। এই সুযোগটা ব্রাহ্মণ্যবাদী মানুষও কাজে লাগান। নমজাতির বিজ্ঞজনেরা স্থির করেন যে, স্বকীয়তা কিছুটা হলেও বজায় থাকে যদি ব্রাহ্মণ্যসমাজের সঙ্গে থাকা যায়। এই সমাজের নারীরা স্বাধীন কিন্তু মুসলিম সমাজে নারী বোরখার অন্তরালে চলে যায়। আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম ততদিনে সর্বভারতীয় হিদুধর্ম এই শব্দ গ্রহণ করেছে। আর যেহেতু 'সিন্ধু-হিন্দু' অঞ্চলের নাম অনুসারে হিন্দুস্থান সেহেতু বঙ্গের নমরাও তাদের হিন্দু বলে মেনে নেয়। কেননা, নামের সঙ্গে 'শূদ্র' শব্দটি যোগ করে দেওয়া হয়। সমাজ পন্ডিতদের হাতে অন্যকোন পথও ছিল না। তবে নমজাতির সঙ্গে শূদ্র যোগে 'নমশূদ্র' রূপে মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধে অনেক সভাসমিতি হয়। Parliamentary Report, Report, The Englishman 1881, 1894, Statement by Joti Bhushan Mitra 1903, Statement by Alakenda Mulkhopadhya 1909 প্রভৃতিতে এর কিছু কিছু তথ্য উল্লেখ রয়েছে। ১৯১১ সালের পর থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত বর্ধমান, বাঁকুড়া, নদীয়া, বীরভুম বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি জেলার নমরা 'নম' হিসাবে পরিচিতি ফিরিয়ে আনার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করেছেন। সেই সব সভা সমিতিতে অংশগ্রহণ করেছেন এমন মানুষ কিছুদিন আগেও জীবিত ছিলেন। এখনও কেউ কেউ জীবিত আছেন।

ইংরেজ বণিকেরা এদেশে একদল কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। যারা গোমস্তা, বেনিয়ান, জমিদার প্রভৃতি নামে পরিচিত ছিলেন। কোম্পানীর ওই সকল কর্মচারীরা যে ভয়ংকর নির্যাতন শুরু করেন তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। আর এই কারণে বাংলার গ্রাম সমাজের ভিত্তি ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। এই চরম ভাঙনের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য মতুয়া আন্দোলনের দুটি ধারা প্রবর্তন করেন। একটি ধারা হল সন্ধ্যা বা বৈকালিক মহোৎসব। যার ধারক-বাহক গোলোক পাগল, হীরামন পাগল, দশরথ বিশ্বাস, লোচন গোসাই, বিচরন পাগল, মহানন্দ পাগল প্রমুখ পাগল, গোঁসাই যারা মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য দ্বাদশনীতি পালনের নির্দেশ দেন—

করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী।।
গৃহধর্ম রক্ষা করে বাক্য সত্য কয়।
বানপ্রস্থী পরমহংস তার তুল্য নয়।।
পরনারী মাতৃতুল্য মিথ্যা নাহি কবে।
পরদুঃখে দুঃখী সদা সচ্চরিত রবে।।
দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহা শুণ্য নাই সাধন-ভজন।।
গৃহ ধর্ম গৃহ কর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে নাম শক্তিই প্রবল।।
জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।

দ্বিতীয় ধারার অন্যতম শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব পন্ডিত রঘুনাথ সরকার। গুরুচাঁদ ঠাকুরের শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সহযোদ্ধা। শিক্ষা-ব্যবসা ও চাকরির সুবাদে নম সমাজে সচ্ছলতা আসে। শিক্ষিত সমাজ গণ আন্দোলনের জন্য নিজস্ব মুখপাত্র প্রকামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। বাংলার কৃষক সমাজের মুখপত্র প্রকাশে অগ্রনী ভুমিকা নেন স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুরের ১৯০৬ সালে আদিত্য চৌধুরীর সম্পাদনায় ওড়াকান্দি থেকে মাসিক পত্রিকা 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' প্রকাশিত হয়।

আদিত্য চৌধুরী নাম ওড়াকান্দী বাসী।
সম্পাদক হন তিনি আনন্দেতে আসি।।
কর্মাধ্যক্ষ সাজিলেন সুরেন্দ্র ঠাকুর।
সত্ত্বাধিকারীর নাম হইল প্রভুর।।

শেখর বন্দোপাধ্যায় তাঁর Cast, Protest and Identity in Colonial India The Namasudras of Bengal-এ লিখেছেন— "From the october 1907 issue of their journal 'Namusudra Shurid' we learn that the delegation had met the lieutenant Governor Sir Lence Lot Hare, and expressed their hopes that

the British Government in India might remain for ever" ১৯০৯ সালে রাইচরণ সরদার ডায়মন্ড হারবার থেকে 'ব্রাত্যক্ষত্রিয় বান্ধব' নামে পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৮ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র পত্রিকা'। ১৯০৯ সালে খুলনার বাগের হাট থেকে 'জাগরণ' পত্রিকা প্রকাশ পায়। ১৯০৯ সালে দৌলতপুর থেকে আরও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম'মুক্তিবার্তা'। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র হিতৈষী'। ওই একই সালে জননায়ক মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে 'পতাকা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তবে কেশবচন্দ্র দাশের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নমঃশূদ্র' পত্রিকাটি বৃটিশ সরকারের কাছে বিপজ্জনক হওয়ায় ১৯১০ সালে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। আর অন্যদিকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের পত্রিকা জনমানসে ক্রমশ অধিকতর প্রভাব বিস্তার করে। বিশেষ রিপোর্ট প্রকাশ পায় In 1908 The circulation of Namasudra was 500, while that of Surid 550, in 1910, the year of the nationalist take over, the circulation of `Namasudra` went down to 300 while that of `Surid` of 450; but in 1911, The year of census while the circulation of Namasudra remind at 300 that of `Surid` shot up to 700.

গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিকে যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তেমনি সাধারণ কৃষিজীবী গরীব মানুষদের সর্তক করে বলেছেন—

অর্থহীন বিদ্যাহীন যারা এইভবে।
রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শান্তি নাহি পাবে।।
সবলে দুর্বলে যদি করিবে মিলন।
সবলে বাড়িবে বল, দুর্বলের মরণ।।

আবার বাংলা ভাগের পক্ষে থাকবে নাকি বিপক্ষে থাকবে এই নিয়ে যখন গোটা কৃষক সমাজ বিচলিত তখন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাদের বলেন—

আমরা দরিদ্র সবে ঘরে নাহি অন্ন।
দেনা দায়ে বাধা সবে চির অবসন্ন।।
বিভাগ হউক দেশ অথবা জুড়ুক।
যা আছে রাজার মনে সেভাবে করুক।।

রাজনীতি-ধর্মনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতি জীবনের প্রায় সব দিকেই সমান দৃষ্টি ছিল হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুরের। মতুয়া আন্দোলনের কর্মব্যক্তিরাও তাঁদের সাধ্যমত সমাজের সবদিকে সমান নজর রাখার চেষ্টা করতেন। আবার হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর সহ গোলক পাগল, হীরামন পাগল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গকে কেন্দ্র করে নানা লৌকিক-অলৌকিক কাহিনী গড়ে উঠেছে। ফলে, জনমানসে বিভ্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হল মতুয়াদের দুর্গাপূজা। হরিচাঁদ ঠাকুর নিজে কখনও দুর্গাপুজা করেন নি। তবে তাঁর অনুগামী ভক্তরা দেবী দুর্গাকে নিয়ে নানা ঘটনা ঘটিয়েছেন। তার মধ্যে অন্যতম হল রাউত খামার নিবাসী হীরামন গোস্বামীর দুর্গাপুজা। সেখানে বাংলায় দুর্গাপুজার প্রচলন শুরু হলেও তথাকথিত হিন্দু অস্পৃশ্য বা অতি অস্পৃশ্য সমাজের সে পুজা মন্ডপে প্রবেশের অধিকার ছিল না। তবু দু-একটি ঘটনা চোখে পড়ার মতো। বেথড়ি গ্রামের ধনী ব্যবসায়ী গোবিন্দ বিশ্বাস এবং তার ভাই চৈতন্য বিশ্বাস পাগল হীরামনকে অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন। যদিও এই বিশ্বাস পরিবার কৃষ্ণভক্ত ছিল। বারোমাসে তের পার্বনের মত অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে এই বিশ্বাস বাড়িতে দুর্গাপুজা হত। ১৮৫৪ সালে মহা অষ্টমীর দিনে হীরালাল পাগল দুর্গাপুজা দেখার জন্য বেথড়ি গেলেন। পুজা মন্ডপের একপাশে বসে ব্রাহ্মণ পূজারীর পূজা প্রনালী দেখতে দেখতে নীরবে কাঁদছিলেন। পুজা চলাকালীন মা দুর্গে, মা দুর্গে বলে প্রতিমার গলা জড়িয়ে ধরে তার কোলে উঠতে গেলে সবাই ধরাধরি করে তাকে সরিয়ে আনেন। পুজারী ব্রাহ্মণও তাঁকে নানাভাবে বুঝিয়ে দেবীর কোলে ওঠা থেকে বিরত রাখেন। কিন্তু হীরামন পাগল কিছুতেই বুঝতে চান না। তিনি বলেন—

মার সেবা অন্তে কিছু প্রসাদ লইব।
মায়ের কোলেতে বসি স্তন দুগ্ধ পিব।।

এই কথা বলতে না বলতেই ছুটে যায় মাটির প্রতিমার কাছে। তারপর—

ডানহস্ত প্রতিমার বক্ষঃপর দিয়া।
বৃদ্ধাঙ্গুলী দিয়া স্তন দেখেন টিপিয়া।।

এতেও মায়ের কোন রকম সাড়া না পেয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন—

এই মা যদি সেই মা হত
তবে দেখামাত্র আমাকে চিনতে পারত।

তারপর অভিমানের সুরে নিজেকে হনুমানের সঙ্গে তুলনা করেন। 'মা যদি সত্যি থাকেন তবে তাকে যেন দেখা দেন' - এই বলে চিৎকার করেন। উপস্থিত সকলে হীরামনের এই পাগলামী তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেন। কেউ কেউ হাসি ঠাট্টা করেন। হীরামন পাগল আচমকা রেগেই ওঠে দুর্গা প্রতিমার ওপর। তারপর বলেন—

সুশীলা দুঃশীলা মত নিষ্ঠুরতা দেখি।
ভিতরে খড়ের ব'ড়ে দুধ পিয়াবা কি।।

কিছু সময় এমনে করে দুর্গা প্রতিমাকে ভর্ৎসনা করার পর মাতৃহারা শিশুর মতো কান্না শুরু করেন হীরামন। তারপর বলেন—

দেখিলাম এই বাড়ি পুজার প্রনালী।
নীলপদ্ম বিনা পুজা খুশি হয়ে নিলি।।
সেই প্রভু হরিচাঁদ হৃদপদ্মে রাখি।
দেবদেবী পুজার্চনা চক্ষে নাহি দেখি।।

নেহাৎ গোবিন্দ চৈতন্য আর তাদের পরিবারের অনেকেই আমাকে প্রচন্ড ভালবাসে তাই এদের বাড়িতে আসি। চোখের সামনে পড়ে গেলি বলে তোর পুজা দেখলাম। এই কথা বলে পুনরায় কান্না করতে লাগলেন হীরামন।

দেখিতে দেখিতে প্রতিমার চোখে জল।
ঝরঝর ঝরিছে অটল যেন টলমল।।
হীরামন বলে মার দয়া উপজিল।
অমনি যাইয়া স্তনে মুখ দিল।।
ঈষৎ চুম্বক মাত্র স্তনে মুখ দিয়া।
ওড়াকান্দি শ্রীধামেতে চলিল ধাইয়া।।

হীরামন পাগলের এই দুর্গা পুজা দেখার কাহিনী সত্য ও মিথ্যাকে মিশিয়া রসরাজ তারক চন্দ্র সরকার করেছেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের জীবনে কোন মূর্তিপূজা ঘটেনি। তিনি কোন পূজা অনুষ্ঠানে গেছেন, তেমন কোন তথ্যসূত্রও নেই।

১৯০২ সালে ওড়াকান্দি ঠাকুর পরিবার প্রথম দুর্গাপুজা হয়। হরিচাঁদ ঠাকুরের নাতি শশীভূষন ঠাকুর পরপর চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। পুত্র সন্তানের জন্য বাড়ির সকলে উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। অবশেষে শশীভূষন ঠাকুর ও অনঙ্গমোহিনী দেবীর কোল আলো করে ওই বছরেই প্রমথরঞ্জন ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে যিনি পি.আর.ঠাকুর নামে পরিচিতি লাভ করেন। প্রথম পুত্র সন্তানের জন্মে শশীভুষন ঠাকুরের মনে ভীষণ আনন্দ হয়। তিনি ওড়াকান্দির বাড়িতে দুর্গা পুজা করছেন এই আশা তাঁর পিতা গুরুচাঁদ ঠাকুরের কাছে প্রকাশ করলেন। সে সময় ঠাকুর বাড়িতে বারুনীমেলা আর কিছু মেয়েলি পুজা ছাড়া অন্য কোন পুজা হতো না। কাজে কাজেই গুরুচাঁদ ঠাকুর দুর্গাপুজা করার সম্মতি দিলেন না। বরং বললেন—

দশ হাতা বেটি আসি দশ হাতে খায়।
ওর পুজা দিতে গেলে রাজা হতে হয়।।
আমরা সামান্য লোক নাহি অর্থ কড়ি।
বিশেষতঃ অল্প স্থান বিল মধ্যে বাড়ি।।

বাবার দুর্গা পুজা করার অনিচ্ছা শুনে শশীভূষণ ঠাকুর মনে খুব দুঃখ পান। পরপর দুদিন অনাহারে থাকেন। কলকাতার ব্রাহ্ম ও বাবু সমাজের সন্তানদের সঙ্গে ভাল ভাব ছিল শশীভূষণ ঠাকুরের। চাঁদমী ডাক্তারদের কয়েকটি পরিবার ও শশীভূষণ ঠাকুরের মাতৃবংশের সকলের ইচ্ছা ছিল যে, শশীভূষণ দুর্গাপুজা করুক। খানিকটা পারিবারিক কলহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তৃতীয় দিনের সকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর দুর্গাপুজা করার অনুমতি দিয়ে দেন। তারকচন্দ্র সরকারের ভাষায় —

শোন শশী অদ্য নিশি দেখেছি স্বপন।
দশভূজা পুজা লাগি কর আয়োজন।।
আমারে স্বপনে দেবী বলিল বচন।
মনোসাধে পুজা নিবে আমার ভবন।।
যশোহরবাসী এক ব্রাহ্মণ সুজন।
চন্ডীস্তব মন্ত্র নাকি করেছে লিখন।।
সেই স্তব মন্ত্রে পুজা এই বাড়ি হবে।
ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজে পুঁথি দিয়া যাবে।।

যথারীতি ঠাকুর বাড়ি দুর্গাপুজার আয়োজন শুরু হয়। বোধন পূজার দিনে দুর্গা দুর্গা বলে ঠাকুর বাড়ি এলেন একজন ব্রাহ্মণ ঠাকুর। নাম কল্পতরু ভট্টাচার্য্য। তিনি গুরুচাঁদ ঠাকুরের সামনে হাত জোড় করে বললেন— আমি যশোহরে বাস করি। দেবী চন্ডীর আদেশে আমি এখানে এসেছি। তিন দিন আগে স্বপ্নে আমি দৈববানী পাই—

শুন দ্বিজ চন্ডী নীতি করেছ রচন।
তব প্রতি প্রীত আমি তাহার কারণ।।
ওড়াকান্দি হরিচাঁদ অবতীর্ণ হল।
লীলাসাঙ্গ করি প্রভু নিজ লোকে গেল।।
তস্যপুত্র রূপে যিনি তিনি মোর গুরু।
মহাকাল মহেশ্বর বাঞ্ছা কল্পতরু।।
তারপুত্র রূপে যিনি শ্রী শশীভূষণ।
দশভূজা রূপে মোরে করিবে পুজন।।
//////////////////////////
চন্ডীস্তুতি লয়ে তুমি করহ গমন।।
তোমার রচিত গীতি সেথা পাঠ হবে।
গুরুচাঁদ কাছে তুমি এই স্তব দিবে।।
আর বলি গুরুচাঁদে বলিও বচন।
পূজা ঘরে নমস্কার না করে কখন।।
গুরুর প্রনাম আমি নিতে নাহি পারি।
বিনয়ে বলিও কথা করজোড়ে করি।।

মহাধুমধামের সঙ্গে ১৯০২ সালেই প্রথম ওড়াকান্দী ঠাকুরের বাড়ী দুর্গাপূজা হয়। বিজয়া দশমীর পরে শান্তি সভা হয় গুরুচাঁদ ঠাকুরের নির্দেশে। কয়েক বছর যেতে না যেতেই ওড়াকান্দী ঠাকুরের বাড়ি দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যায়। এই দুর্গাপূজা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। ১৯০৬ সালে অষ্ট্রেলিয়ান খ্রিস্টান মিশনারীর অন্যতম ধর্মপ্রচারক ডা. সি.এস. মীড্-এর সঙ্গে গুরুচাঁদ ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সেইসময় খ্রিষ্টান মিশনারীর নানান সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করতেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর ডা. সি.এস. মীড্কে তার মিশনারী পরিচালনার জন্য অনেক জমি দিলেন। শুধু তাই নয় গ্রামবাংলার নিরক্ষর অবহেলিত সমাজ সম্পর্কে নানাভাবে জানালেন। প্রকৃতপক্ষে, দুজনেই পরস্পরের প্রতি টান হওয়ার বিশেষ কারন ছিল। ডা. মীড মনে করতেন যেহেতু একটা বিশাল জাতির প্রানপুরুষ হলেন গুরুচাঁদ ঠাকুর তাই গুরুচাঁদ ঠাকুরকে বোঝাতে পারলে ব্যাপক মানুষকে সে খ্রীষ্টান ধর্মে দিক্ষা দিতে পারবেন। তেমনি গুরুচাঁদ ঠাকুর দেখলেন এই বিশাল অস্পৃশ্য নিরক্ষর পশুতুল্য জীবনযাপনকারী জাতিকে শিক্ষিত করতে ব্যাপক

অর্থ এবং সরকারী সহযোগিতা দরকার। সুতরাং ডা. সি.এস.মীড্‌কে দিয়েই এই পিছিয়ে রাখা সমাজের উন্নতি করাতে হবে।

মীড্ ভাবে গুরুচাঁদ নিব নিজ দলে।
গুরুচাঁদ ইচ্ছা কার্য করাব কৌশলে।।

কিন্তু যতই মীড্ সাহেব গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথায় কাজ করুন না কেন, সমাজ উন্নয়নের জন্য মীড্‌সাহেবের কাজকর্মকে যত প্রসংশাই করুন না কেন, কাজের কাজ হচ্ছে না কিছুই। অর্থাৎ কেউই খ্রিষ্টান ধর্মে দিক্ষা নিচ্ছেন না। বরং মতুয়ার সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এমন কী মীড্ সাহেব নিজেই ক্রমশ গুরুচাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই একদিন মীড্ সাহেব জানতে চাইলেন— খ্রিষ্টান ধর্ম যদি আপনার কাছে এত সুন্দরই হবে তবে আপনি তা গ্রহণ করছেন না কেন? বরং আপনার গৃহে মাটির তৈরী দুর্গাপূজা কেন হয়? আপন সমাজ কেন অন্ধ কুসংস্কার ছেড়ে আমাদের এই বিশ্ববন্দিত মুক্তধর্ম খ্রিষ্টানধর্মে আসছেন না? নানান অছিলায় মীড্‌কে সমস্যাদি বোঝালেন এবং বললেন খুব শীঘ্রই এই বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করবেন। আসলে তখনও পর্যন্ত গুরুচাঁদ ঠাকুর মীড্ সাহেবকে দিয়ে যে যে কাজ করাবেন তার অনেক বাকি ছিল। ১৯১০ সালের ১৬ মে বিকাল বেলায় গ্রামের কিছু মোড়ল এবং বেশ কিছু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নিয়ে গ্রামবাসীদের সামনেই আলোচনা সভা করেন। আলোচনা সভায় গুরুচাঁদ ঠাকুর বলেন—

ডকটর মীডের কথা কিছু মিথ্যা নয়।
মেটে মূর্তিপূজা করা বড়ই অন্যায়।।
আরো আমি দিনে দিনে বুঝিতেছি সার।
খ্রিষ্টধর্ম তুল্য ধর্ম নাহি কিছু আর।।

একথায় গ্রামের কিছু মানুষ অসন্তুষ্ট হলেও ডা. মীড্ খুব খুশি হলেন। আসলে গুরুচাঁদ ঠাকুর যা চেয়েছিলেন তাই হয়েছে। দুবছরের মধ্যে মীড্ সাহেব যা যা কাজ করেন তা এক কথায় অসাধারন—

স্কুল হল দুরে গেল চন্ডালত্ব গালি।
নমজাতি ক্রমে হল প্রতিপত্তিশালী।।

দূর্গাপূজা বন্ধ হওয়ার কয়েক বছর পর অর্থাৎ ১৯১০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের ছোট ছেলে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যান। সমাজের ব্যাপক উন্নতি ও পরিবর্তন হলেও গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিবারে বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম হল সন্তানের মৃত্যু, পরিবারের ও নিকটতম কয়েকজন আত্মীয়ের নানারকম ব্যাধি। বঙ্গভঙ্গ রোধের ফলে বেশ কিছু কাছের নেতৃত্ব স্থানীয় মানুষ গুরুচাঁদ ঠাকুরকে ভুল বোঝেন এবং তারা নানাভাবে তাঁকে অপদস্থ করতে থাকেন। আসলে এজাতি হল পরশ্রীকাতর। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পুনরায় দুর্গাপূজার প্রচলন করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু গুরুচাঁদ কিছুতেই রাজী হন না—

দশভূজা পূজা মোরা করি পুনরায়।
দেবীপূজা হলে তাতে সর্বশক্তি হয়।।
প্রভু বলে এই কার্য আমি না করিব।
মরণের ভয়ে শেষে দেবতা ডাকিব।।

গুরুচাঁদ ঠাকুরের কথায় কেউ কেউ খুশি হলেন না। সবাই মনঃদুখে দিন কাটাতে লাগলেন। বেশ কয়েক বছর এভাবে যাওয়ার পর ১৯১৪ সাল থেকে ওড়াকান্দী ঠাকুর বাড়িতে দুর্গাপূজা পুনরায় শুরু হয়। তারক চন্দ্র সরকার তার গ্রন্থে গুরুচাঁদের মুখে বসালেন— 'জীর্ণা দীনা রুগ্না এক নারী' সে শিবের ললনা। এই বাড়িতে তার পূজা হোক এই তার প্রার্থনা। কাজে কাজেই দেবীর আকুতি মেনে নেওয়া হল—

দেবী নিজে পূজা লাগি করিল বিনয়।
তাহারে বিমুখ করা উচিৎ না হয়।।

এত কিছু সত্ত্বেও নমদের জীবনে তেমন ঠাই মেলে না। গোটা মতুয়া সমাজে একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর হলেন হরিচাঁদ ঠাকুর। গুরুচাঁদ ঠাকুর পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনদের চাপে পড়ে দুর্গাপূজার মতামত দিয়েছেলেন। নিজে কখনও দুর্গাপূজা প্রাঙ্গনে যেতেন না। যতদুর জানা যায়, পূজার কয়দিন তিনি বাড়িতেও থাকতেন না। পারিবারিক ও আত্মীয় স্বজনের চিঠি, আত্মকথা, গান, তারক চন্দ্র সরকারের হাতের লেখা পান্ডুলিপি, সরকারী নথিপত্রে কোথাও দুর্গাপূজায় গুরুচাঁদ ঠাকুর অংশে গ্রহণ করেছেন তার উল্লেখ নেই। আসলে দেবদেবীর উত্থান সম্পর্কে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্যক ধারণা ছিল। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাঁতাকলে নিজে এবং নিজের সমাজকে কখনই টেনে নিয়ে যান নি। সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত দেবীপূজা বিতর্কমূলক। হরিচাঁদ ঠাকুর ১৮৩৩ সালে স্থানীয় জমিদারদের সঙ্গে বিরোধের পর সফলডাঙ্গা ত্যাগ করে ওড়াকান্দি চলে আসেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী শহরে বসবাসকারী পড়ন্ত বেলার বাবু জমিদারদের বেশিরভাগ অর্থ আসত জমিদারি থেকে অর্থাৎ কৃষকেরা গায়ের ঘাম ঝরিয়ে যে ফসল ফলাতেন তা বিক্রি করে। বেশিরভাগ কৃষক তিন মাসের খোরাকি পেতেন। ছলে-বলে নিরক্ষর কৃষকদরে ঠকিয়ে জমিদার–জোতদারদের বিলাস বহুল জীবনযাপন চলত। দেশি-বিদেশি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে গরীব চাষি মজুরদের চড়া দামে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে হত। বলা যায় ১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন পাশের পর গরীব কৃষক পরিবারে আর্থিক ধ্বস্ নামে। সামাজিক নির্যাতন বেড়ে যায় বহুগুন। জমিদার, জোতদার, মহাজন বা আর্থিক সম্পন্ন বড় কৃষক কর্তৃক জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে সারাদিন কাজ করার পোশাকি নাম বেগার খাটা। দরিদ্র কৃষককুলের এই বেগার খাটা ছিল বাধ্যতামূলক। এই বেগার খাটার বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন গোটা মতুয়া সমাজ।

বঙ্গদেশে দাস ব্যবস্থা প্রচলন ছিল। কাজ দেওয়ার নাম করে শক্তপোক্ত তরুন বা মাঝ বয়সি জেলে, মাঝি, মুটে কৃষক অর্থাৎ প্রান্তবাসীদের দাস হিসেবে বিক্রয় করে দেওয়া হত। ১৮৪৬ সালে নম মতুয়াদের প্রতিবাদে দাসপ্রথা সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হয়। সেকালে বাংলায় একটি মারাত্মক কুপ্রথা ছিল। তার নাম ছিল নরবলি প্রথা। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী অস্পৃশ্য-অতিঅস্পৃশ্য সমাজের সুন্দর, সুঠাম, সবল ছোট ছোট বাচ্চা-কিশোরদের ধরে নিয়ে তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিক মন্দিরের

সামনে বা তন্ত্রসাধনাস্থলে বলি দিতেন। হরিচাঁদ ঠাকুর পুণ্য অর্জনের নামে এই জঘন্য প্রথা বন্ধ করার জন্য মহোৎসবে সকলকে নরবলি প্রথার অসারতা সম্পর্কে বোঝাতেন। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই বিভিন্ন জেলার নাম মতুয়াদের গ্রাম সভায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে হাজার হাজার বছর ধরে জাঁকিয়ে বসা ভাববাদী ধর্মের নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে মানুষ সচেতন হতে শুরু করেন। সে সময়ে 'শাস্তি বিক্রয় নামে একটি অমানবিক কৌশল প্রচলিত ছিল। শহরের বা গ্রামের ধনী বাবু সম্প্রদায় শাস্তি বিক্রয় করতেন। কোন ধনী বাবু বা মহাজন বা তাদের অকর্মন্য বিলাস প্রিয় লম্পট পুত্র বা আত্মীয় কাউকে খুন, ধর্ষণ বা শাস্তিযোগ্য বা নিশ্চিত কারাবাসের সম্ভাবনা থাকলে ওই অপরাধী বা তার আত্মীয় কোন আর্থিকভাবে দুর্বল কোন মানুষকে কিছু টাকার লোভ দেখিয়ে কখনো বা তার পরিবার বা সন্তানাদির ভরন পোষণের আর্থিক দায়ভার নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিতেন। সরল বিশ্বাসী নিরক্ষর গরীব মানুষ বাবুর কথায় বিশ্বাস করে ওই সব শাস্তিযাগ্য অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে শাস্তিভোগ করতেন। অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ধর্মীয় ভয়ভীতি ও চরম দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে ব্রাহ্মণ্যধর্মীদের এই চালাকি 'শাস্তিবিক্রয়' করার প্রতিবাদে নম মতুয়ারা গ্রামে গ্রামে সভা করে সমাজ সচেতন করতেন। হরিচাঁদ ঠাকুরের মতুয়া মতাদর্শ প্রকৃত পক্ষে নমদের প্রবাহমান জীবনের প্রকৃতি ও সমাজ বিশ্লেষণ থেকে অর্জিত বস্তুবাদী দর্শন, যা শ্রমজীবী সমাজের যুক্তি-বিজ্ঞানভিত্তিক সাম্য ভাবনায় উদ্ভুত।

নমদের যেহেতু নিজস্ব একটি সাম্যবাদী মতাদর্শ ছিল, সেইহেতু, সুন্দর সুখে জীবনযাপন করার জন্য তাঁদের কারো প্রতি নির্ভর করতে হত না। বিশেষ করে থাকার জন্য ঘর-বাড়ি, খাওয়া-পরা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নিতে পারতেন। আর এই কারণেই এদের ভয়ও নেই ভগবানও নেই। এই অহংকার অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীর কাছে বিষময় হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল রাষ্ট্র ব্যবস্থার বাইরে থাকার জন্য অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষ এদের অস্পৃশ্য করে রাখে। চন্ডাল বা চাড়াল নামে গালি বাচক শব্দে এদের ডাকা হত। শুধু তাই নয়, সরকারের কাছে এদের দাঙ্গাপ্রবণ জাতি রূপে পরিচিতি ঘটান হয়। এমনকি তৎকালীন ব্রিটিশ কারাগারগুলোতে নম বন্দীদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত। ১৮৪২ সাল থেকে নমরা জমিদার-জোতদার, সুদখোর মহাজন, ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে আত্মসম্মান ও আত্মমর্যাদার ও সাম্যের অধিকারে আপোসহীন সংগ্রাম শুরু করেন। যার ফলস্বরূপ ১৮৭৩ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী গোনাপাড়া হাটে এই নম মতুয়ারা জমিদার–জোতদার-উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সাম্যের দাবীতে সাধারণ ধর্মঘট ডাকেন। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার নড়েচড়ে বসেন। সরকার বাহাদুর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। শেষমেশ ১৮৭৩ সালের ৭জুন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর এল.সি. অ্যাক্ট সরকারি আদেশ নামা করে কারাগারে বৈষম্যমূলক কার্যকলাপ বাতিল করেন। লোকচক্ষুর আড়ালে থাকা এই ঐতিহাসিক আন্দোলন পৃথিবীতে বিরল। এশিয়াতে প্রথম।

হরিচাঁদ ঠাকুর তার অনুগামীদের পিতা-মাতা, স্ত্রী–কন্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করে বলেছেন—

সংসারে থেকে যার হয় ভাবোদয়
সেই সে পরম সাধু জানিবে নিশ্চয়।

পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, আত্মা হরিচাঁদ বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করতেন না দীর্ঘশ্বাস বা গুরুবাদে। তারক চন্দ্র সরকার তার হরিলীলামৃত লিখেছেন—

দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন
মুক্তি স্পৃহা শূণ্য নাই সাধন-ভজন।

মতুয়াদের তিনি বলতেন—

করিবে গার্হস্থ্যজীবন লয়ে নিজ নারী
গৃহে থেকে ন্যাসি বানপ্রস্থ ব্রহ্মচারী।

অর্থাৎ টাকা পয়সা খরচ করে তীর্থে তীর্থে ঘুরে না বেড়িয়ে, গুরুদেবের নিকট থেকে কানে অর্থহীন বীজমন্ত্র না নিয়ে, অলীক ব্যক্তি (ঈশ্বর, ভূত-প্রেত বা শয়তান) বা বিষয় নিয়ে সাধন-ভজন, কৃচ্ছসাধন না করে, চরিত্র পবিত্র রেখে, সত্য বাক্য মুখে বলে, নিজ বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে সুখে থেকে, পিতা-মাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে, গৃহের কাজকর্ম সম্পাদন করে, পরহিতার্থে কর্ম করাই গৃহী মানুষের জীবনযাপনের প্রকৃত কর্তব্য। অলীক এ অমানবিক শাস্ত্র–বিধির বিরোধিতা করায় গোঁড়া উচ্চবর্গের পন্ডিত সমাজ, জমিদার, জোতদার, মহাজন ও সদ্য গজিয়ে ওঠা শহরের 'বাবু' সম্প্রদায় একত্রিত হয়ে মতুয়াদের নানারকম অত্যাচার শুরু করেন। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, পুকুরে বিষ দেওয়া, বাড়ি ভাঙচুর, জোরপূর্বক ধান কেটে নেওয়া, সামাজিক বয়কট মতুয়াদের প্রতি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। সামাজিক গঞ্জনা ও আর্থিক দুরবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নম-মতুয়ারা ঐক্যবদ্ধ হন। হরিচাঁদ ঐক্যবদ্ধ মতুয়াদের জোর কদমে এক ফসলী জমিকে তিন ফসলী কৃষিকাজ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি বললেন—

সর্ব কার্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষি কার্য হয়
ত্রিফলা না করা আমাদের ভাল নয়।

কৃষিকাজের পাশাপাশি ব্যবসায় কীভাবে ধন লাভ করা যায় হরিচাঁদ সে শিক্ষাও দিলেন—

নিজহাতে ব্যবসা করেন হরিচাঁদ
বাণিজ্য প্রণালী শিক্ষা সবে কৈল দান

নম মতুয়াদের সমাজ রক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব ছিল নমলাঠিয়াল। সুবল ঢালি, যশা বাড়ৈ কালু সর্দার প্রমুখ লাঠিয়ালরা নীলকর সাহেব ও তার সাকরেদদের তাড়া করে পিটিয়ে মারতেন। বিভিন্ন সরকারী নথিতে উল্লেখ মেলে দাদন, খাজনা, পুজো-পার্বন উপলক্ষে কর আদায়, নীলচাষ করায় পুলিশ চৌকিদার দিয়ে সামাজিক অত্যাচার সহ নারী নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মতুয়া লাঠিয়ালরা কয়েকজন নায়েব ও অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে নীল জ্বালানোর কড়াইতে সেদ্ধ

করে মেরে ফেলেন।

১৮৭৮ সালে হরিচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ মতুয়া আন্দোলনের দায়িত্ব পালন করেন। গুরুচাঁদ ঠাকুর লক্ষ্য করলেন শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও রাজনীতিই খেটে খাওয়া মানুষের সার্বিক উন্নতির চাবিকাঠি। ১৮৮০ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুর ওড়াকান্দিতে নিজের বাড়িতে পাঠশালা স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা আন্দোলনের গাতি সঞ্চার করেন। তিনি তাঁর অনুগামী ও সহযোগী মানুষজনকে মুক্তকণ্ঠেই আহ্বান জানান—

সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে
অবিদ্বান পুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।

গুরুচাঁদ ঠাকুর জানতেন যে, মানুষকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করার জন্যই সর্বস্তরে শিক্ষা প্রচার করা একান্ত দরকার। তাই জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে দিলেন— কবি মহানন্দ হালদারের 'গুরুচাঁদচরিত'-এর

শিক্ষা আন্দোলন যবে প্রভু করে দেশে দেশে
ভকত সুজন যত তার কাছে আসে
নম সাহা তেলি মালি আর কুম্ভকার
কাপালি মাহিষ্য দাস চামার কামার।
পোদ আসে তাঁতি আসে আসে মালাকার
কতই মুসলমান আসে ঠিক নাহি তার।

নারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচারের চিত্র বদলানোর জন্য গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৬–১৯৩৭) পিতা হরিচাঁদ ঠাকুরের পথ অনুসরণ করলেন। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন, স্ত্রীলোক গৃহলক্ষী হয় তখন যখন সে শিক্ষিতা ও বুদ্ধিমতী হয়। তাই নারী শিক্ষার বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য ওড়াকান্দিতে নিজের বাড়িতে প্রথম পাঠশালা করেন—

নারী শিক্ষার তরে প্রভু আপন আলয়
শান্তি সত্যভামা নামে স্কুল গড়ি দেয়।

নারী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা স্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরী করেন। মহিলাদের মাতৃকালীন পরিসেবার জন্য মিশনারীদের সহযোগিতায় নারী কল্যান স্বাস্থ্য কেন্দ্র গড়ে তোলেন। হরিচাঁদ ঠাবুরের শিক্ষা বিস্তারের মশাল গুরুচাঁদ ঠাকুরের হাতে দীপ্তিমান হয়। বলা যায়, শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয় গোটা অন্ধকার বাংলা। সে সময় শিক্ষিত কৃষক সন্তানেরা সরকারি চাকরি দাবী করলে মনুর বিধান শুনিয়ে ভদ্র বাঙালি পন্ডিত সমাজ তাদের কঠোর শাস্তির জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান। সমগ্র প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সরকারি চাকরির দাবির আন্দোলন আরও তীব্র হল। ১৯০৭ সালে পূর্ববঙ্গে সর্বপ্রথম 'Representation of Communities in Government Services Act, 1907'-এর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগের ব্যাপারে তথাকথিত নিম্নবর্গ ও মুসলমানদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ১৯০৭ সালেই গুরুচাঁদ ঠাকুরের পুত্র শশীভূষণ ঠাকুর সাব-রেজিষ্টার পদে যোগ দিলেন। ১৯০৮ সালে কুমুদবিহারী মল্লিক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং তারিনী বল সরকারি ডাক্তর হিসাবে চাকরিতে যোগ দিলেন। তথাকথিত নিম্নবর্গীয় বাংলার কৃষক সমাজের মুখপত্র প্রকাশে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন স্বয়ং গুরুচাঁদ ঠাকুর। ১৯০৬ সালে আদিত্য চৌধুরীর সম্পাদনায় ওড়াকান্দি থেকে মাসিক পত্রিকা 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' প্রকাশিত হয়। ১৯০৮ সালে ঢাকা থেকে 'নমঃশূদ্র পত্রিকা', ১৯০৯ সালে খুলনার বাঘেরহাট থেকে 'জাগরণ', দৌলতপুর থেকে 'বঙ্গকথা' ও 'মুক্তিবার্তা' প্রকাশিত হয়।

হরিচাঁদ ঠাকুর বুঝে ছিলেন কোন ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া তখনই সম্ভব যখন দুটি ভিন্ন শক্তি মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাই তিনি তার স্বজাতিকে তাদের প্রবহমান জীবন আর্দশকে শ্রমবিমুখ ক্ষমতা লোভিদের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে গুরুচাঁদ ঠাকুর ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। যারা অবহেলিত, ঘৃণিত, যারা চিরকাল বুক উজাড় করে দিল পেল না কিছুই তাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানালেন—

'বিদ্যা চাই ধন চাই রাজকার্য চাই'। তিনি বুঝেছিলেন—

যে জাতির দল নেই
সে জাতির বল নেই
যে জাতির রাজা নেই
সে জাতি তাজা নেই।

বাংলার খেটে খাওয়া মানুষজনদের সঙ্গে নিয়ে সভা-সমিতি করে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শক্তিশালী সংগঠন করেন। যার মাধ্যমে তথাকথিত অস্পৃশ্য, অতিঅস্পৃশ্য সমাজকে সতর্ক করেছেন, উদ্দীপ্ত করেছেন। পিছিয়ে রাখা ৯০ শতাংশ মানুষের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এক সংগ্রামী সজাগ বার্তা দিলেন—

''বিদ্যা যদি পাও কাহারে ডরাও
কারদ্বারে চাও ভিক্ষা।
রাজশক্তি পাবে বেদনা ঘুচিবে
কালে হবে সে পরীক্ষা।''

১৯৩৭ সালের ইলেক্শানে গোটা বাংলা থেকে ৩২ জন পিছিয়ে রাখা সমাজ থেকে নির্বাচিত হন। এদের মধ্যে থেকে ১২ জন ছিলেন নমজাতির মানুষ। যাদের মধ্যে অন্যতম যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, বিরাট চন্দ্র মন্ডল, পি.আর.ঠাকুর, রসিক লাল বিশ্বাস প্রমুখ। বিশেষ উল্লেখযোগ্য মহারাষ্ট্রে পরাজিত হওয়া প্রতিভাধর ডা. বি.আর.আম্বেদকরকে গুরুচাঁদ ঠাকুরের উত্তরসূরীরা ভোট দিয়ে জিতিয়ে গণ পরিষদে পাঠিয়েছেন। তবে একথা সত্য গুরুচাঁদ ঠাকুর একদিকে যেমন রাজনীতিতে অংশগ্রহন করার প্রস্তাব দিয়েছেন, তেমনি সাধারণ কৃষিজীবী গরীব মানুষদের সতর্ক করে বলেছেন—

“অর্থহীন বিদ্যাহীন যারা এই ভবে
রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা শান্তি নাহি পাবে।
সবলে দুর্বলে যদি করিবে মিলন
সবলে বাড়ির বল, দুর্বলের মরণ।”

১৯৩৭ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের মৃত্যুর পর সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে মতুয়া আন্দোলন তার স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলে।

আর্যদের ভারতে আগমন ও তিনটি প্রশ্ন

সমীম কুমার বাড়ৈ

শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই কমবেশী ইতিহাস জ্ঞানের অধিকারী। বস্তুত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পাঠ্যসুচিতে ইতিহাস একটি বিষয় থাকার জন্য সাধারণভাবে ইতিহাসের প্রচলিত ধারনা বয়ে বেড়ায় অধিকাংশ মানুষ। খুব কম লোকই আছে যারা যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণ দ্বারা ফেলে আসা দিনগুলো দেখতে চায়। ফলে সেখানে অনেক ভুল তথ্যের মধ্যে ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে মোহগ্রস্থ হতেই ভালোবাসে মানুষ। আমরা আর্যদের আগমন ও তাদের কর্মকান্ডকে তেমনই দেবত্ব শক্তির মিশেল হিসাবে দেখেছি ও মোহগ্রস্থ হয়েছি। প্রচলিত ইতিহাসকে কখনও প্রশ্নে মুখোমুখি দাঁড় করাইনি। অথচ আর্যদের ভারতে আগমন, বিস্তার, তাদের কৃত তথাকথিত বৈদিকসভ্যতা ইত্যাদির সাথে যুক্ত হয়ে আছে কত হাজার অতিকথন, প্রশ্ন তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। সব প্রশ্নের অবতারণা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় এবং তা সম্ভবও নয়। আর্যভারতের সাথে যুক্ত মূলত তিনটি বিষয়কে একবিংশ শতাব্দীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

১) আর্যদের বৈদিকসভ্যতা কি আদৌ উন্নত ছিল?
২) ঘোড়ার ব্যবহার কি অনার্য ভারত জানত, না কি আর্যরাই ঘোড়া এনেছিল?
৩) লোহা গলানোর প্রকৃত কারিগর কারা?

সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক কারা আর্য ছিল, তাদের আবাসস্থান কোথায় ছিল। ভাষাশাস্ত্র—সাহিত্যের ঐতিহ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ইরানীয়দের সাথে ভারতীয় ধর্ম বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, আচার বিচারের অনেক মিল আছে। প্রাচীন ইরানীয়দের ‘আবেস্তা’ও প্রাচীন ভারতীয়দের ‘ঋগ্বেদ’-এর সঙ্গে এমন অনেক সাদৃশ্য আছে। আবার আর্যদের চেনা পশুপাখি, গাছপালা ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে অনেক প্রত্নতাত্বিক বলেন— আর্যরা ইউরোপ থেকে এসেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের বলকান দেশসমূহের থেকে এসেছিল। কিন্তু অধিকাংশ প্রত্নতাত্বিক বিশ্বাস করেন যে এই জনগোষ্ঠী দক্ষিণ রাশিয়ার উড়াল পর্বতমালার কাছ থেকে ইরান হয়ে ভারতে ক্রমে প্রবেশ করেছিল।পামির মালভুমিকে আদি আর্যদের বাসস্থান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। অবশ্য একদল ইতিহাসবিদ্ প্রমান করার চেষ্টা করেন— ভারতই আর্যদের আদি নিবাস। কিন্তু দ্রাবিড় ও আর্যদের ভাষা, সংস্কৃতি এবং সভ্যতার পার্থক্য থেকে এই যুক্তির অসারতাই বেশি পরিলক্ষিত হয়। ষষ্ঠ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপ্পো সাসেটি (হুদ্ধদদ্র (খন্স্‌এগ্ধ) সংস্কৃত ভাষার সাথে ইউরোপের মূল ভাষাগুলির মিল খুঁজে পান। অন্যান্য তথ্যসূত্রে আর্যদের বাইরে থেকে অনুপ্রবেশকেই সমর্থন করে। মূলতঃ ধরা হয় তারা ককেশিয় অঞ্চল থেকে এসেছিল। আর্যরা যাযাবর হিসাবে এই সমস্ত অনুর্বর অঞ্চল থেকে ভ্যাগ্যান্বেষণে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। ম্যাক্সমুলার-এর মতে ঋগ্বেদ সম্ভবত রচিত হয়েছিল ১২০০-১০০০ খিষ্টপূর্বে। আর্যদের আগমন ঘটেছিল ২৫০০-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বে। সদ্য আবিষ্কৃত মেহেরগড় সভ্যতাকে ধরে সিন্ধুসভ্যতার বয়স দাঁড়ায় প্রায় আট হাজার বছর। সাম্প্রতিক খনকার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায় মেহেরগড় থেকে মহেঞ্জদারো-হরপ্পার বিশাল বিস্তৃত অঞ্চলে রয়েছে অনেক গণকবর। অধিকাংশ দেহগুলির মুন্ডচ্ছেদ করা হয়েছিল। অস্থি কঙ্কালের বয়স এবং আর্যদের ভারতে আগমনের বয়স মোটামুটি সমসাময়িক। ঐতিহাসিকগণ সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম

প্রধান হিসাবে আর্যদের বর্বর আক্রমণকেই দায়ী করে। মুন্ডকাটা নরকঙ্কাল আবিষ্কারের ফলে আর্য আক্রমনের তত্ত্বই বেশী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছু কিছু পন্ডিত অবশ্য আর্যদের অনুপ্রবেশকে দেখেছেন অতি উন্নত জনগোষ্ঠী দ্বারা পশ্চাৎপদ দ্রাবিড় আদিবাসীদের পদানত করা হিসাবে। সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার পরও কেউ কেউ এই অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বকথা আওড়ে আসছেন।

আমাদের প্রতিনিয়ত শেখানো হচ্ছে আর্যরা গ্রামভিত্তিক সভ্যতা গড়ে তোলার ফলে দেশে কৃষি, ধর্ম-সাহিত্য, শিক্ষার সমৃদ্ধি ঘটেছিল। প্রশ্ন হচ্ছে আর্যরা কৃষিটাই বা শিখল কখন? তথ্য প্রমানের ভিত্তিতে এ বিশ্বাস এতদিনে দৃঢ় হয়েছে আর্যরা ছিল যাযাবর, পশুপালক। খাদ্যান্বেষণে একস্থান থেকে অন্যত্র প্রতিনিয়ত তাদের যেতে হত। কৃষি গড়তে দরকার স্থায়ী জনবসতি এবং প্রকৃতি নির্ভর শ্রম সাধনা, যা আর্যদের কোনো কালেই ছিল না। তারা যে সমস্ত অঞ্চল থেকে এসেছিল তাদের মধ্যে এখনও অনেকাংশে বেদুইন চরিত্র বর্তমান। সুতরাং একথা মেনে নেওয়া খুব মুশকিল— লুট করতে করতে আসা জনগোষ্ঠী এসেই চাষাবাদের মতো একটা শ্রমনির্ভর শিল্প আয়ত্ব ও তার উন্নতি সাধন করেছিল। ভারতের মত শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে থাকতে থাকতে তারা হয়ত দ্রাবিড়দের কাছ থেকে কৃষিকাজ শিখেছিল ধারাবাহিক ভাবে। আজ সারা বিশ্বে প্রমানিত সত্য যে নগর সভ্যতার বিকাশ যাদের আগে ঘটেছিল তারা উন্নত জাতিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে আর্যরা আসার প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে নগরসভ্যতা দ্রাবিড়রা গড়ে তুলেছিল। আর্যরা নাকি সুর-দেবতা, আর দ্রাবিড়রা-অসুর। আর্য নামক তথাকথিত দেবতারা সমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস করে আমাদের দেশের বিকাশকে সাড়ে আট হাজার বছর পিছিয়ে দিয়েছে। নগরসভ্যতার সাথে দ্রাবিড় সভ্যতায় কৃষিরও ব্যাপক বিকাশ ঘটেছিল। প্রতিদিনের আবিষ্কার আমাদের অবাক করে দেয় যে সেচ থেকে চাষাবাদ ছিল অত্যন্ত বিজ্ঞান ভিত্তিক। আমরা একবিংশ শতাব্দীতে এসে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি নগরায়ণ ও শিল্পায়ণ কতটা জরুরী দেশের উন্নয়ণে। তা না হলে আর্যদের দায়ী করব না দেশের এই পশ্চাৎপদতার জন্য? যাদের আগমনই জাতিকে পিছিয়ে দিল সাড়ে আট হাজার বছর বা তারও বেশী।

লোহার কথা। বলা হয়, আর্যরা নাকি লোহার ব্যবহার শিখিয়েছিল দ্রাবিড় ভারতেকে। ডাহা অসত্য কথা। আর্যরা আসার অনেক আগেই মধ্য ভারতে তামা গলানো পদ্ধতি জানত দ্রাবিড়রা। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে মধ্য এশিয়া কিংবা ইরানে উন্নতমানের লৌহ আকরিকের ভান্ডারটি কোন অঞ্চলে অবস্থিত? কোনো কালে কি তেমন কোনো লৌহ ভান্ডারের অস্তিত্ব ছিল? আর্যরা কবে কখন শিখল লোহা থেকে ইস্পাতে আয়ুধ নির্মানের কৌশল? ঋগ্বেদে এসবের কোনো উল্লেখ নেই কেন? লোহা বা ইস্পাত বোঝানোর মত কোনো প্রতিশব্দই ছিল না প্রাচীন বৈদিক ভাষায়। পুরাণের গল্প মতে আর্যদের নায়ক ছিল ইন্দ্র। বেদের এই গল্পে হিন্দুদের অগাধ বিশ্বাস। ইন্দ্রের মত বীরযোদ্ধা আর কেউ ছিল না। অসুরদের তুড়ি মেরে নিধন করে ফেলতে পারত। তার হাতে বজ্র নামক অস্ত্র সর্বদা বিরাজমান। এ ছবি আমাদের মানসচক্ষেও গেঁথে আছে। বজ্র তৈরী হয়েছেল দধীচি মুনির হাড় দিয়ে। প্রত্নপ্রস্তর যুগেরও অনেক আগে হাড় দিয়ে অস্ত্র তৈরী হতো কারণ তখন মানুষ ধাতুর ব্যবহার জানত না। তা হলে আর্যরা লোহার ব্যবহার বা লোহার অস্ত্র বানাতে জানত-এ কথা বিশ্বাসের যৌক্তিকতা কি?

আদিবাসী—কোলদের একটি গোষ্ঠী এখনও 'অসুর' নামে পরিচিত। ছোটনাগপুর মালভুমির বিভিন্ন অংশ এবং উত্তরবঙ্গের চা-বাগানে বহু 'অসুর' শ্রমিক হিসাবে কর্মরত। গুলমা ও লোহারদাগা অঞ্চলে এদের বসবাস। এরা লৌহ—মাটি বা আকরিকের লোহা গলাতে পারে। পূর্ব পুরুলিয়ার অসুর গোষ্ঠীর মানুষেরা তামা গলাতে পারে এবং বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র তৈরী করতে পারে। পরবর্তীতে এরা ঝালদা ও বাঘমুন্ডিতে অসুর-কামার নামে পরিচিত হয়। তাদের তৈরী নানান লোহার দ্রব্য বিভিন্ন জনগোষ্ঠী চাষাদের কাজে ব্যবহার করে আসছে অনাদি কাল থেকে। পার্সিদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তা অনুসারে 'অহর' হল সর্বোচ্চ দেবতা। সংস্কৃতে 'স' ইরানীয়দের 'হ' উচ্চারণযুক্ত। বারবার ভারতে আর্য-আক্রমণ হয়েছে এবং তাদের প্রতিহত করেছে প্রাগার্যরা। তারা বলবান, নগরসভ্যতা সৃষ্টিকারী। 'অহর'দের আর্যরা উচ্চারণ বিকৃতি করে বানিয়ে দিল অসুর। আজকের ঝাড়খন্ডে, পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদনীপুর (পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গের চা বাগানগুলিতে লোহা গলনকারী জনগোষ্ঠী অসুর বা চাপুয়া কামার নামে পরিচিত। আর্য যাযাবরের আগমনের বহু আগেই তারা এ বিদ্যা আয়ত্ব করেছিল। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলারে আউসগ্রাম (১) ব্লকের দরিয়াপুর, বাঁকুড়া জেলার বিকনা ও পশ্চিম মেদনীপুর জেলায় ডোকরা শিল্পীরা বহুদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। ডোকরা একটি আদিবাসী শিল্প হিসাবে স্বীকৃত। যদিও এই শিল্প সাধনার সাথে যুক্ত লোকদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার আদিবাসী হিসাবে স্বীকারই করে না। কিন্তু চেহারা ও ভাষায় অস্ট্রিক শব্দ থাকায় তাদের মধ্যে আদিবাসী লক্ষণ স্পষ্ট। ভারতবর্ষে প্রাপ্ত প্রাচীনতম ডোকরার নিদর্শন— মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত সুন্দরী নর্তকীর মূর্তি। খোপায় কাঁটা, গলায় হার, হাতে চুড়ি পরে অপূর্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে এক নর্তকী। দ্রাবিড় সভ্যতায় আবিষ্কৃত ডোকরার বয়স ৪০০০ বছর-এরও বেশী। কী অপূর্ব প্রাচীন নিদর্শন। ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িমা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে ডোকরা শিল্পীরা এখনও একেবারেই আদিমতম পদ্ধতিতে তামা গলিয়ে শিল্পসামগ্রী বানায়। তাদের সৃষ্ট শিল্পকর্মের মধ্যে আদিবাসী চেহারা ও লোকসংস্কৃতির ছাপ স্পষ্ট। তারা যে পরিমান তাপ ব্যবহার করে তার থেকে সামান্য তাপ বাড়ালেইলোহাগলে যায়। আর্য যাযাবররা বরঞ্চ তাদের ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদে লোহা গলনকারীদের বা তামা গলনকারীদের অবজ্ঞার চোখে দেখে এসেছে অনাদিকাল থেকে। ব্রাহ্মণরা কোনোদিন কর্মকারদের পেশা গ্রহণ করেছে এমন প্রমাণ নেই। তারা বরাবরই শ্রমবিমুখ পরজীবী জাতি।

আর্যরা এসেছিল সেখানে লোহা কেন, লোহার আকর দেখাও সম্ভব নয়। যারা লোহা দেখল না, যারা তামা গলাতে শিখল না তারা এদেশে এসেই লোহার ব্যবহার চালু করে দিল? লোহা গলানোর বিদ্যা কি আর্যদের জানা ছিল? জানা ছিল কি লোহা থেকে ইস্পাতের আয়ুধ নির্মানের কৌশল? লোহা গলানোর কাজ যারা করে তাদের প্রতি বাহ্মণদের ঘৃণা আর্য আগমনের থেকেই। অথচ হাতের কাছে দলমা, গুরুমহিষানী পাহাড়ে সর্বোচ্চ মানের লৌহ আকরিকের অফুরন্ত ভান্ডার। প্রাচীনকালে তামাজুড়িতে তামা গলিয়ে কুড়ল বানিয়েছিল কারা? আর্যরা তো এ অঞ্চলে ঢুকেছে খ্রিষ্টপর শতাব্দীতে। কাঠকয়লার চুল্লীতে হাপর বা ভস্ত্রা ব্যবহার করে লোহা গলানোর মত তাপ পাবর্তী কালে মৌর্যযুগের ধাতু নিষ্কাষণকারীরা আয়ত্বে এনেছিল। মানুষগুলোর পরিচয় কি? নির্দ্বিধায় বলা যায় তারা অনার্য অর্থাৎ ভূমিপুত্র। তামাজুড়ির কুড়োলটি বয়স দশহাজার বছরও হতে পারে কিংবা তারও বেশী। আর্য যাযাবর পশুপালকদের লোহা-তামা গলানোর কাল্পনিক গল্প লোহার পাথরবাটির মত দাঁড়াল না কি? আর্যরা এসেছিল লুট করতে করতে। তাদের সাথে কোনো মহিলা পর্যত ছিল না। যেহেতু গায়ের রং ফর্সা ও গায়ের জোর তাদের বেশী ছিল তাই তারা পরাজিত দ্রাবিড়দের মালিক সেজে বসল। জৈবিক চাহিদা ও বংশ বিস্তারের জন্য তাদের

দরকার ছিল নারীদের। তারা বাধ্য হল দ্রাবিড় মেয়েদের বিয়ে করতে। অসুর বা এই শূদ্র নারীদের গর্ভজাত সন্তানদের নিয়ে তারা গড়ল মহাফাঁপরে। শূদ্রের গর্বজাত সন্তান কি করে আর্য বা ব্রাহ্মণ হয়? তখন তারা তাকে পৈতে দিয়ে বা উপনয়ণ করে দ্বিজ করল। ব্রাহ্মণ হল। মনুসংহিতার কারণে এখনও সব নারীই শূদ্র। ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মানো সব ছেলে-মেয়ে শূদ্র হয়ে জন্মায়, দ্বিজ করে ছেলেদের ব্রাহ্মণ করা হয়। ব্রাহ্মণের মেয়ে কিন্তু চিরকাল শূদ্র থেকে যায়। তাদেরও গায়ত্রীমন্ত্র পাঠের অধিকার নেই। এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে আদিতে অর্থাৎ আগমনপর্বে তারা নিজেরাই সামাজিক অস্থিরতা ও বিপন্নতার মধ্যে ছিল। সুতরাং লোহার ব্যবহার কেন, কোনো বড় কাজই তাদের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

দিল্লীর কুতুবমিনার প্রাঙ্গনে অবস্থিত লৌহস্তম্ভ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় তৈরী হয়েছিল। আনুমানিক সময় ৯১২ খ্রিষ্টপূর্ব। মৌর্যরা ছিল অনার্য। আদিস্থান ছিল উদয়গিরি গুহার মধ্যে। স্তম্ভটির উচ্চতা ৭.১২ মিটার, বেড় ১.১৭ মিটার। প্রাচীন পরম্পরা মেনে লোহার কাজ হত মধ্যভারতের ধর বা লৌহপুরা এবং হোহঙ্গিপিরে। এও অনার্যদের সৃষ্টিশীল কর্ম। যার গঠনশৈলী আজও বিস্ময়কর। সুতরাং আর্যদের রোহার প্রচলন তত্ত্ব মানতে হলে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে প্রস্তুত কোনো ঐতিহাসিক?

আর্যদের দ্রাবিড় ভারতকে ঘোড়ার ব্যবহার সেখানোর গল্প ঘোড়ার ডিমের মত একটি অলীক কল্পনা। একথার খানিকটা যুক্তি থাকতে পারে যে আর্যরা ঘোড়ায় চড়ে এদেশে অনুপ্রবেশ করেছিল। তাদের ক্ষিপ্রতা, দৈহিক শক্তি, ঘোড়ার গতি ইত্যাদি অনার্য সভ্যতার সাধকদের পরাজিত করতে সহায়তা করেছিল কারণ দ্রবিড়রা ছিল নগরায়ণ, কৃষি, নৃত্যগীতি, অলংকারশিল্প সাধনায় ব্যস্ত। তাদের শক্তিসাধনার প্রয়োজন হয়নি। জীবিকার অনিশ্চয়তা তাদের ছিল না। আর্যরা নিজেদের দেবতার বংশধর মনে করত। প্রাথমিক ভাবে কাশ্মীর তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে তারা দেবতার রাজ্য বা স্বর্গ হিসাবে ভাবত। মেহেরগড়-সিন্ধুসভ্যতা ধ্বংস করে আর্যরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। ঋতু বৈচিত্র, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, চাহিদার চাইতে খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান প্রাচীন অসুর সভ্যতার মানুষ যেমন ছিল আরামপ্রিয় তেমনি সাম্যবাদী ও মানবিক। ফলে দুর্ধষ্য লুণ্ঠনকারী যাযাবরদের প্রতিহত করা প্রাথমিকভাবে সম্ভব হয নি। পরে আর্য আক্রমণের সময় অসুররা জোট বাঁধল কৈবর্তগোষ্ঠীর সাথে। কৈবর্তগোষ্ঠীর নেতাকে বলা হত 'মহামন্ডলিকা' বা মহিষ। আর্য আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে প্রাগার্যদের যে জোট হয়েছিল তার নেতুত্ব দেয় মহিষাসুর। দেবতা নামক আর্যরা বারে বারে অসুরদের কাছে পরাজিত হয়ে স্বর্গচ্যুত হত এবং মধ্যপ্রাচ্যে পালিয়ে যেত। অসুররা তাদের সৃষ্ট লোহার অস্ত্রসস্ত্র ব্যবহার করত। পরে অবশ্য দুর্গা নামক এক নারীর ছলাকলায় আমোদপ্রিয় অসুর নেতা মহিষাসুর গুপ্তঘাতকের হাতে খুন হয়। এই ষড়যন্ত্রের বীজ রচিত হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যের কোনো এক আশ্রমে যেখানে পরাজিত দেবতারা (?) পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিত। পরে সংগঠিত হয়ে অতর্কিতে আক্রমণ চালাত অনার্য জনপদ, শহর প্রান্তরে এবং ধ্বংস করে দিত সব। তারপর হারিয়ে যায় অসুরদের সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস। আর্য যাযাবরদের ক্ষিপ্রতার সাথে তারা এঁটে উঠতে পারেনি। কিন্তু তাতেই প্রমাণ হয়ে গেল দ্রাবিড়ভারত ঘোড়ার ব্যবহার জানত না? আমরা প্রত্যেকেই জানি কচ্ছের রাণ গুজরাটে অনাদিকাল থেকে গাধার বিচরণভুমি। এখন প্রমাণ মিলছে গুজরাট তথা উত্তরভারত একটা বিশাল অঞ্চল ব্যপি হরপ্পাসভ্যতার বিস্তার ছিল। এটা ধরা যেতে পারে ঘোড়ার পূর্বপুরুষ গাধার সাথে ভারতের অনেক আগেই পরিচয় চিল। তারা দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করত।

এখন আমরা প্রায় সকলেই জেনে গেছি ভীমবেটকার কথা। ভীমবেটকায় পাহাড়ের গায়ে ২৪৩ টি প্রস্তরখন্ডে অসাধারণ রক পেন্টিং আবিষ্কার হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের বিন্দ্যাঞ্চলে পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে এগুলি ভি.এস.ওয়াকাস্কার ১৯৫৭ সালে নথীবদ্ধ করেন। ঐ অঞ্চলে সর্বমোট এরকম ৭০০ টি প্রস্তরচিত্র আছে। এই প্রস্তরচিত্র বা গুহাচিত্রগুলির বয়স অনুসারে ৭টি ধাপে ভাগ করা হয়েছে। আদিপর্ব প্রায় দেড়লক্ষ এবং শেষতম পর্ব ১০,০০০ খ্রিষ্টপূর্ব ধরা হয়। যখন ভারতে তথাকথিত সুশিক্ষিত আর্যরা আসেইনি। কি আছে সেইসব প্রস্তরচিত্রে? তীরধনু নিয়ে শিকারদৃশ্য, ফুল, পাখি, বিভিন্ন পশু, ঘোড়ায় চড়ে মানুষ যাচ্ছে, ঘোড়াসহ শোভাযাত্রা। অর্থাৎ ঘোড়ার চমৎকার ব্যবহার। এখানে যে রং ব্যবহার করা হয়েছিল তা প্রায় আধুনিক রংকেও হার মানায়। তখন তো আর দূরদর্শন ছিল না যে ঘরে বসে আর্যদের ঘোড়ার ব্যবহার দেখে অনার্যরা ঐ চিত্র আঁকবে। এতে প্রমান হয় ঘোড়ার ব্যবহার অনার্যভারত বা দ্রাবিড়ভারত আর্যদের আসার বহু হাজার বছর আগেই জানত।

পশ্চিম মেদনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায় শ্মশান বা সমাধিক্ষেত্রের আশেপাশে মাটিতে পোঁতা এক ধরনের পাথরের গায়ে খোদাই করা রয়েছে অশ্বারোহী মূর্তি। এগুলির বিভিন্ন নাম— হিরো স্টোন, বীরস্তম্ভ, প্রেতশিলা বা আত্মাপাথর। স্টেলো ক্রামরিশ অশ্বারোহী মূর্তিটিকে বলেছেন— স্পিরিট রাইডার, যা বাংলায় দাঁড়ায় প্রেত-সওয়ার। তেমন প্রেতসওয়ার আমি বাঁকুড়া জেলায় খাতড়া মহাকুমায় নানা গ্রামে দেখেছি। এগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণার পাশে, পুরুলিয়া জেলায় আদিবাসী বা প্রান্তিকশ্রেনীর মানুষজন অধ্যুষিত প্রাচীন অঞ্চলে দেখা যায়। প্রেতসওয়ার মূলতঃ পারলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত ছিল। এই আচারের মূল কেন্দ্র বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশের মাঝামাঝি এলাকায় বলে ধরা হয়। পারলৌকিক আচারের অঙ্গ হিসাবে পিতলের অশ্বারোহী মূর্তি পশ্চিমবঙ্গেও চালু আছে। ডোকরা কর্মকাররা পিতল ঢালাই করে এই মূর্তি বানায়। কিন্তু ভারতের মাঝ বরাবর থেকে প্রেতসওয়ার 'কাল্ট' বা ধর্মাচার ছড়িয়ে পড়েচিল কেন? দুটো দুই জিনিস-পিতলের ঘোড়সওয়ার আর শিলাপাটা কোদাই করা ঘোড়সওয়ার। তবে দুই-ই ঘোড়সওয়ারের মূর্তি আর দুই-ই পারলৌকিক আচারের সাথে যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের পিতলের ঘোড়সওয়ার বানায় ডোকরা শিল্পীরা আর মধ্যপ্রদেশে পিতলের এবং লোহার ঘোড়সওয়ার বানায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের শিল্পীরা।

অনেকের বিশ্বাস ক্ষত্রিয় কিংবা রাজপুত সামন্তবর্গের কৌলাচার হিসাবে এটি শ্রাদ্ধের অঙ্গ ছিল। সেই হিসাবে এই ধর্মাচার আর্য উত্তরাধিকার বলে গণ্য করতে হয়। কিন্তু এই যুক্তিও খাটে না। কারণ— (১) শাস্ত্রে, পুরাণে কোথাও আচারটির উল্লেখ নেই। (২) বহিরাগত কোনো জনগোষ্টীর সঙ্গে এই প্রেতসওয়ারের যোগ পাওয়া যায়নি। (৩) অশ্বারোহী খোদাই পাথরের পাটাকে হিরো স্টোন বা বীরপাথর বলাও ঠিক নয়। একটা বৃহৎ শিলা বা মনোলিথ—এর সঙ্গেও এর কোনো যোগ নেই। (৪) পাথর উৎকীর্ণ প্রেতসওয়ার আর পিতলের প্রেতসওয়ার মূর্তি একই সংস্কৃতিক উৎস থেকে উদ্ভুত তাও নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে ডোকরা কামারদের বানানো পিতলের অশ্বারোহী মূর্তি জিতাষ্টমী ব্রতের জন্য ব্যবহৃত

হয়ে থাকে। কিন্তু জিতাষ্টমী বা জীমূতবাহন পুজোর জন্য ব্যবহৃত মূর্তি এই ব্রতের সাথে সম্পর্কিত জীমূতবাহনের নাও হতে পারে। কারণ জীমূতবাহন ছিল নিরস্ত্র। ব্রতকথার গল্পে নরমাংস ভক্ষণকারী গরুড়কে নিজের হাতে খেতে দিয়ে সে অহিংসার পরিচয় দিয়েছিল। জঙ্গলমহলে এক সময়ে জৈনধর্মের বিস্তার ঘটেছিল কংসাবতীর অববাহিকা ধরে। এর মধ্যে জৈন বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অহিংস ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব থাকলেও থাকতে পারে। প্রেতসওয়ার অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত। প্রাচীন অষ্ট্রিক ভাষা সাঁওতালিতে ঘোড়ার প্রতিশব্দ 'সাদম' পাওয়া যায়। 'সাদম' শব্দটি আর্যভাষা থেকে ধার করা নয়। সাঁওতালি লোককথা তা তাদের ধর্মগ্রন্থ 'বিনতী' তে সাদম শব্দটি অর্থাৎ ঘোড়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। সিঙসাদম ছিল দুষ্টুঘোড়া যে সর্বদাই সিঞবোঙার স্বপ্ন সাধনা ধ্বংস করে দিতে চায়। আবার গোন্ড উপজাতি পারলৌলিক আচার হিসাবে পাথরের গায়ে ঘোড়া উৎকীর্ণ করে। ঘোড়ার সাথে পরিচয় না থাকলে এই সব আদিবাসীদের জনজীবন ঘোড়া এল কোথা থেকে? শুশুনিয়া পাহাড়ের উপত্যকায় প্রত্নতাত্ত্বিক পরেশ দাশগুপ্ত একটি জীবাশ্ম পেয়েছিলেন। তার বয়স হয়ত কয়েক লক্ষ বছর। কল্পনা বিলাসীরা আর্য ঘোড়ার আগমনের বয়স অতটা ভাবতে পারবে কি?

বাঁকুড়া জেলার অসংখ্য লোকদেবতার অধিষ্ঠান। প্রাচীন জনপদে বা গ্রামে তাদের অবস্থান। একান্তই গ্রামদেবতা-আর্য সংস্কৃতির সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। পূজা-পার্বনে ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণ নেই। তেমন কিছু লোকদেবতার পূজাচারের সংক্ষিপ্ত বর্ননা দেওয়া হল—

ঝাঁপুড়্যা রাইপুর থানার সারকোলের গ্রাম্য দেবতা ঝাঁপুড়্যা। শেওড়াতলায় থান। প্রতীক মাটির হাতি-ঘোড়া। আদিবাসী মাঝি সমাজের 'গুলি' পদবীধারী ব্যক্তি তার পূজারী। পশুপাখি বলি দেওয়া হয়। কথিত আছে, তার মাথাভর্তি এলোমেলো জটা। তাই তিনি ঝাঁপুড়্যা।

কঁকাঠাকুর রাইপুর গ্রামে ভয়ভীতির দেবতা কঁকাঠাকুর। বাসুলী থানের পাশেই তার অবস্থান। প্রতীক হাতি-ঘোড়া। ঝোঁপে তার অবস্থান। 'বড় ভোগ' (মদ) দিয়ে তার পূজা হয়। শাণ্ডিল্য গোত্রের লোহাররা তার পূজারি।

বনপাহাড়ী সিমলাপাল থানার হাতিবাড়ির গ্রামদেবী বনপাহাড়ী। কালাপাহাড় ও বঘুৎ তার সঙ্গী। হাতি-ঘোড়া তাদের প্রতীক। জঙ্গলে তার থানা। তপশিলী মাঝি তার পূজারি। খিচুড়িভোগ ও মাংস দেওয়া হয় নৈবেদ্যে।

খুদ্যানাড়া ছাতনা গ্রামে আছে খুদ্যানাড়া। একটা পাথরের পাটায় বীরমূর্তি খোদিত, কুদ্যানাড়ার প্রতীক অশ্বারোহী প্রেতসওয়ার বা প্রেতশিলা। এমন বীরমূর্তি ছাতনার কামার কুলিতে থুম পাথরে অসংখ্য স্থানে আছে। গবেষকরা এগুলিকে বলেন— মুন্ডাদের সমাধিপ্রথার নিদর্শন। এখন ব্রাহ্মণ পূজারি কিন্তু কর্মকার প্রধান ব্রতী। সংস্কৃত্যায়নের ফলে ব্রাহ্মণের প্রবেশ ঘটেছে অনার্য লোকধর্মে।

এমনই গ্রামদেবতারা হল— আমতুশ্যা (পায়রাচালি গ্রাম, ইঁদপুর থানা), তেঁতুলিমিলা (মনিহারা-টোলা মোহনডাঙ্গা, ছাতনা), কয়রাবুড়ি (কুলমুড়া গ্রাম, বোকুড়া থানা)। এইসব দেবদেবীও হাতি-ঘোড়ার প্রতীকে বিদ্যমান। প্রায় সবাই আদিবাসীদের দ্বারা পূজিত। মদ, মাংস নৈবেদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পশুবলী, লরালঝুটি মোরগ বলি হয়। যদিও আদিতেও সব গ্রামদেবতার পূজারি ছিল অনার্যরা কিন্তু বর্তমানে কোথাও কোথাও ব্রাহ্মণরা পূজারি। এটা অনার্য লোকজীবনে সংস্কৃত্যায়নের আগ্রাসন।

যে সমস্ত গ্রামদেবতা বা গ্রামদেবীর উল্লেখ করলাম প্রত্যেকের সাথে প্রতীক হিসাবে হাতি-ঘোড়া বর্তমান। আদিবাসীরা বা অনার্যরা এই সব আঞ্চলিক দেবদেভীর পূজা অসম্ভব যাদুশ্বাস ও কুসংস্কার থেকে শুরু করেছিল। পূজার উপকরণ হিসাবে 'বড় ভোগ' অর্থাৎ মদ, মাংস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। পশুপাখি াল দেওয়া হয়। এর সবগুলোই অষ্ট্রিক জনগোষ্টীর আচারের সাথে যুক্ত। কিন্তু একানে যে বিষয়টি মুখ্য তা হল— হাতি-ঘোড়াকে প্রতীক হিসাবে ব্যবহার। জঙ্গলমহলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল হাতির বিচরণভূমি। কিন্তু এই পান্ডব বর্জিত রাজ্যের আদিবাসীক সম্প্রদায় ঘোড়ার ব্যবহার করে থেকে জানল? শুশুনিয়া পাহাড়ের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন ঘোড়ার জীবাশ্ম আবিস্কার, ডোকরাশিল্পীদের প্রেতসওয়ার প্রস্তুত কৌশল, আদিবাসীদের পাথর পটে বীরমূর্তি খোদাই বা প্রেতসওয়ার খোদাই, সাঁওতালী 'বিনতী' তে 'সাদম' এবং প্রাচীন জনপদ আদিবাসীদের গ্রামদেবতা হিসাবে ঘোড়ার প্রতীক ইত্যাদির মধ্য ধেকে কি এ সিদ্ধান্ত াসা যায় পারি না যে আর্যরা আসার হাজার হাজার বছর আগেই ভূমিপুত্রদের সাথে ঘোড়ার পরিচয় ছিল? ঘোড়সওয়ারী বীরপক্ষকে বা প্রেতসওয়ারকে ঘোড়ার ব্যবহার ছাড়া আর কি বলা যায়?

লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির নিদর্শন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করাই যথেষ্ট নয়। এর দরকার ঐতিহাসিক মূল্যায়নও। তার জন্য উপাদান সমূহ যেমন বস্তুগত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সহায়তা করবে, তেমনি লোকসাহিত্য সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত কথাগুলি পড়ে ফেলতে পারলে প্রাচীনতম ইতিহাসের সন্ধিক্ষনের দ্বারও খুলে যেতে পারে।

যে সমস্ত কথা সমগ্র প্রবন্ধে উল্লেখ করলাম তার ঐতিহাসিক মূল্য তেমনই বিরাট এবং সম্ভাবনাময়। এরকম নজির সারা ভারতের প্রাচীন এনপদের সাথে সর্বত্র সম্পৃক্ত হয়ে আছে। তথাকথিত ঐতিহাসিকরা এসবের দিকে ফিরে তাকানোর ফুরসৎ পায়নি। তারা ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গের মাতব্বরিতে মজে আছে দিনের পর দিন। এ কথা অস্বীকার করতে অসুবিধা নেই।আমাদের ইতিহাস শিক্ষা শুরু হয়েছিল বিদেশীদের চোখ দিয়ে। সেই সব ইউরোপীয় পন্ডিতবর্গ এখনও মানতে চায় না ব্রাহ্মীলিপি ভারতীয় কারণ তার পূর্ববর্তী কোনো লিপি ভারতে পাওয়া যায়নি। সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার এখনও সম্ভব হয়নি। ফলত, ইউরোপীয় পন্ডিতরা মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত সিলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ চিহ্নগুলিকে লিপি বলেই মানতে চায়নি। সিলমোহরগুলিতে খোদিত হয়েচিল একশিঙ্গ অশ্ব বা এক সিঙওয়ালা অশ্ব সাদৃশ প্রানী। সামাজিক ুচ্চবর্গের প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখানেও ঘোড়ার গল্প। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র সাহিত্যের কাল্পনিক ভিত্তির উপর ইউরোপীয় সমাজবদলের ধারকবাহক পন্ডিতবর্গের অলীক 'আর্য আগ্রাসন তত্ত্ব' দ্রাবিড় ভাষা সমূহের উপর গ্লানিকর ভাবে চেপে বসেছে। বাংলা সহ অনেক অনার্য ভারতীয় ভাষা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রষ্টকার ফলশ্রুতিতে হয়েছে, এ তত্ত্ব ভাঙার সপক্ষে অনেক প্রমান ইতিমধ্যে হাতে এসেছে। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ উল্লেখ করতে পারি—

(১) আদিমকালের আন্তর্মহাদেশীয় জনস্থানান্তরের দ্বারা উত্তর-পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল

পাবর্তীকালে সভ্য মানুষদের আন্তর্জাতিক মিলনকেন্দ্রে পরিগনিত হয়েছিল।

(২) খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে ভূমধ্যসাগরীয় উত্তর-পূর্ব উপকূলের সিসিলিয়া থেকে পুরাতন প্যালেস্তাইন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে হুরিয়ানদের মিতান্নি রাজ্য সভ্যজাতি সমূহের বানিজ্য ও সংস্কৃতিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। হরপ্পা-মহেঞ্জদারোর সাথেও হুরিয়ারদের বানিজ্যিক আদান-প্রদান ছিল। ফলে ঐ সব অঞ্চলে আককাডীয় ভাষায় অনেক ভারতীয় অনার্য শব্দের প্রবেশ ঘটেছিল। বানমুখী লিপিতে ঙ্খথ— — থ—হ্ঠত্র সেগুলি লিখিতরুপ লাভ করেছিল। তুরস্কের রোগাজকয় অঞ্চল থেকে মর্মর লেখরুপে রক্ষিত সেই শব্দভান্ডারের সন্ধান মিলেছে এবং সেগুলির পাঠোদ্ধার হয়েছে। যেমন উনুন, বটি, শিকে, দজ্জাল, আঁধার, ছোকড়া, আক্রা, ছুরি, আল, নালা ইত্যাদি অজস্র শব্দ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শব্দগুলি প্রায় অপরিবর্তিতরুপে বাংলার কৃষকদের মধ্যে বিশেষত পূর্ববঙ্গের কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত আছে। এতে প্রমানিত হয় (ক) মহেঞ্জদারো–হরপ্পার সুবর্নযুগে সেখানকার প্রাকৃতভাষীরা হুরিয়ানদের সাথে ব্যবসা চালাত (খ) পরবর্তীকালে স্থানাতর সভ্যতা গঠনের একস্তরে তারা বাংলার কৃষি সভ্যতা গড়েছিল। প্রাকৃতভাষা, তার শব্দ বানমুখীতে প্রথমে লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হতো এবং বাংলার কৃষকদের পূর্বপুরুষেরা আজ থেকে অন্তত চার হাজার বছর পূর্বে আতর্জাতিক ব্যাক্তি ছিলেন।

(৩) মিশরের আমরানা লেখ্যমালায়ও এমন অনেক শব্দ মেলে। যা সম্ভব হয়েছিল নানুর, বিনপুর, মহিষাদল এবং মঙ্গলকোট–এর সাথে বানিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ফলে। আমরানা লেখ্যমালার প্রাপ্ত কিছু শব্দের নমুনা— কুপি বা কুপো, ধামা, পিথাগ, বান/বণ্যা, পিদিম/ শিয়াল, ষাঁড়, বেহুলা, মোচা, ঘাস, আলসে, ডাকিনি ইত্যাদি।

তথাকথিত আর্যদের মুখ নিঃসৃতবানী বিশেষত প্রাকৃতভাষার এমন বিশাল শব্দভান্ডার আছে সেখানে সংস্কৃতে তৎসম বা তৎভব–র পিছনে ছোটার দিন বোধ হয় শেষ। বরঞ্চ, সুমেরীয় ও হিব্রুভাষায় বাংলা শব্দের ভান্ডার খোঁজা যেতে পারে। ভাসা সাহিত্যেও আর্য আগ্রাসনের এবং তার উৎকর্ষতার তত্ত্ব তাসের ঘর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। প্রাত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গুজরাট ও মহারাষ্ট্র অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মীলিপি এবং খরোষ্ঠীলিপি পাওয়া গেছে। কোনো মিশ্ররূপ যাওয়া যায় নি অথচ বাংলায় বহুসংখ্যক ব্রাহ্মী, খরোষ্টী এবং ব্রাহ্মীখরোষ্ঠী মিশ্রলিপি যাওয়া গেছে পান্ডুরাজের ঢিবি (বর্ধমান), বানগড় (দক্ষিন দিনাজপুর), মহাস্তানগড় (বগুড়া, বাংলাদেশ), ভাওয়াল (ঢাকা), সিলুয়া (নোয়াখালি), চন্দ্রকেতুগড় (উত্তর ২৪ পরগনা), হরিনারায়ণপুর (দঃ ২৪ পরগনা), তমলুক (পূর্ব মেদনীপুর) প্রভৃতি স্থানে। এগুলি খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চম শতাব্দীর কীর্তি বলে প্রমানিত। আর্যরা তখনও পূর্ব ভারতে আসেনি। ফলে আর্য ভাষা-সংস্কৃতির আধিপত্যবাদের তত্ত্ব প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের মহান কবি রামাই পন্ডিত বাংলা লিপিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ 'শূণ্যপূরাণ' লিখে সগর্বে ঘোষণা করলেন— 'নমসব পড়াল পন্ডিত চারিজনা / পন্ডিতে দক্ষিনা দিল রজতকাঞ্চন'। বিদেশি ঐতিহাসিকগণ এ দেশের ভাষা সংস্কৃতি বুঝতে পারেনি। তাদের ভাবনায় উত্তরসুরী দেশীয় ঐতিহাসকরা অধিকাংশ শ্রেনীস্বার্থের উপরে উঠতে পারেনি। কারণ আর্য স্বার্থ রক্ষাকারী ধর্মসাহিত্য রচিত হয়েছেল পরাজিত ভূমিপুত্রদের বা অসুরদের হেয় করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সিন্ধুসভ্যতার বা মিশরীয় সভ্যতার ঘোড়ার যোগসুত্র পাওয়া যায়নি বলে এসব পন্ডিতদের সিদ্ধান্তে উপোনীত হতে ও সময় লাগল না যে ভারতে ঘোড়ার আর্য আগমনের আগে ব্যবহার ছিল না। মধ্য এশিয়ার তৃণভূমি ছিল ঘোড়ার স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র। ফলে আর্য যাযাবররা নাকি তাদের পোষ মানিয়ে অনার্য ভরতেকে ঘোড়ার ব্যবহার শেখাতে এসেছিল। একথা অবশ্য তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যেতে পারে, ার্যরা লুট করতে করতে কিছু ঘোড়া নিয়ে ভারতে আসতে পারে কিন্তু ভারতে ঘোড়া ছিলনা, একথা বলার অবকাশ কোথায়?

আর্য আগমনের সাথে যুক্ত তিনটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজলাম। বোধ হয় বলার সময় এসেছে— আর্যদের উন্নততর বৈদিকসভ্যতা, লোহার গলানো ও ঘোড়ার ব্যবহার প্রচলন করার মত তিনটি বিষয়ই দাঁড়িয়ে আছে এক ধরনের কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের তাগিদের উপর। সাথে যুক্ত হয়ে আছে লুটেরা আর্যজাতির উত্তরসুরী মানুষগুলির সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষিত রাখার প্রয়াস। এই তিনটি প্রশ্নে সমাধান এভাবে খুঁজলে এক ধাক্কায় তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে আর্যদের শ্রেষ্ঠত্বের, শৌর্য-বীর্যের কাল্পনিক মিথ বা অতিকথন। মজার ব্যাপার হচ্ছে যুগযুগ ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ কাজগুলি করে চলেছে অনার্যরা আর তার সুবিধা ভোগ করছে আর্যরা। 'রামায়ন' রচনা করলেন দস্যু রত্নাকর, মহাভারত - পাটনী মৎস্যগন্ধা সত্যবতীর পুত্র ব্যসদেব। এঁরা দুজনেই অস্পৃশ্য। আর ভারতের সংকিবধানের জনক ডঃ বি. আর আম্বেদকর তো ঘোষিত দলিত। বিজ্ঞানবলে পৃথিবী আজ নিত্য নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির। ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের অপ্রতুলতা অনেকাংশে কমছে— ধারাবাহিক প্রত্নতাত্বিক খননকার্যে ও আদিম সমাজের জীবন-সংস্কৃতি আলোয় আসার জন্য। এখন শুধু প্রচলিত ইতিহাসের বিকল্পস্বরে বস্তুনিষ্ঠ কথা বলার সময়।

তথ্যসূত্র

(১) ভারতবর্ষের ইতিহাস— কোকা আন্তোনভা, গ্রিগোরি বোন্‌গার্দলেভিন, গ্রিগোরি কন্তোভস্কি। প্রগতি প্রকাশন, মস্কো।

(২) অশ্বরোহী এক দেবতা এবং মৃতের পুনর্জীবন লাভ— অনিমেষ কান্তি পাল। সমীক্ষাপত্র লোকায়ত, প্রথম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা–২০০৪।

(৩) দুর্গাপূজোর অন্তরালে — সমুদ্র বিশ্বাস। চেতনা লহর, যুগ্ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১২-মার্চ ২০১৩।

(৪) ডোকরা গ্রাম — নিজে পুড়ে অন্যকে আলো দেয় - সমীম কুমার বাড়ৈ, ২৬ ডিসেম্বর, বর্তমান।

(৫) বাঁকুড়া জেলার লোকধর্ম ও লোকদেবতা — মিহির কুমার কামিল্যা, পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা, ১৪০৯।

(৬) (ঠ্ডস্নত্রন্থ— ঙ— ত্বত্র— ঠজ— ত্মখৃ ঞ্চন্ত্র ছ্বস্ঠদ্রহ্ব ঙত্র ঞ্ল ১২০৬ ঙ্গৃ ঞ্চন্দ্রডথন্ঠথ— ন্ডথ্স্ঠ্রী (ত্মত্রত্বস্তুন ঞ্চন্থদ্বথন্থ—হ.

(৭) বাংলাভাষা আমাদের গর্ব এবং আমাদে দায়। সুনীল কুমার রায়। ১৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩ কলম।

(৮) (হ—হডথন্থ— জ্ঞ—। থ— ত্ম ঙান্ডস্ঝদ্রন্ত্মদ্র—, ঙ্খথ— — থ—হ্ঠত্র ডদ্রত্বথত্নস্তন্হ— স্কত্র— স্তুও থ— দ্রঠত্র জক্কস্থথত্তত্বঠস্দ্র জ— ত্মখৃ দ্বদ্রঠত্র ঠদ্র— ন্ডত্রৃ স্কদ্রন্ঠদ্র—, থঞ্চূ১৯৯৫

৯) ড. লীনি শ্রীনিবাসন —'মিশর থেকে বাংলা শব্দ'। প্রোরেনাটা, কলকাতা বইমেলা - ২০১৩।

রবীন্দ্র– গীতা ‘তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ

আশীষ লাহিড়ী

প্রযুক্তি আর বিজ্ঞানকে প্রথম থেকেই আলাদা করে দেখেচিলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯২৫ সালে তাঁর রচনায় আধুনিক প্রযুক্তি-যন্ত্রের ‘আশীর্বাদ’-এর অনুল্লেখ দেখে বিস্মিত ও অখুশি হয়েছিলেন রবীন্দ্র-অনুরাগী বিজ্ঞানী-লেখক হ্যাভলক এলিস। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে প্রযুক্তির মধ্যে সৌন্দর্য নেই, আছে কেবল ত্ত্বত্র— ত্ত্ব্র তাই তো সৃজনশিল্পের উদ্দীপনা জাগায় না। তরুন অমিয় চক্রবর্তী তখন রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্তি-বিমুখ বিজ্ঞান অবগাহনকে সমর্থন করে লিখেছিলেন, ‘বিজ্ঞানকে এরকমহত্ত্রদ্রদ্বখ— ঈ্থত্র দ্মস্থ— ত্রগ্গএ স্ডন্থদ্বত্র করে দেখাতে কে পেরেছে— যাতে চিন্তা, কল্পনা, অনুবূতির বিচিত্র ধারা এক অপরূপ সৌন্দর্য্য সৃষ্টিতে এসে চরম ব্যঞ্জনা লাভ করেছে? আমি ওঁকে (এলিসকে) বলতে চাই যে আপনার (রবীন্দ্রনাথের) কবিতায় শহর বা রাস্তা বা রেলগাড়ীর বর্ণনা খুঁজতে গিয়ে উনি ভুল করেছেন– ওরকমহ্ত্রদ্রন্দ্বখ্থ্দ্র— ওতে না খুঁজে এইটেই দেখতে হবে যে তাহ্ত্রদ্রন্দ্বএত্ম দ্রুঠ্ঠত্র স্দ্ধুহ্ঠ দ্র ঠত্র হ্বত্রএন্ কিনা।’১

কিন্তু বছর পঞ্চাশ পর মনে হয় অমিয় চক্রবর্তীর ধারনা বদলেছিল। প্রযুক্তির ফসল এরোপ্লেন কিংবা জাহাজ শুধুই রবীন্দ্রনাথ কথিত ত্ত্বত্র— ত্বা-র বহিঃপ্রকাশ, তা মানুষের কল্পনাশক্তিকে রুদ্ধ করে, এ কথা ঠিক মনে হয়নি তাঁর। ১৯৭৬-৭৭ নরেশ গুহকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি ‘কিন্তু প্লেনে বসে আমরা কফিও খাই, কবিতাও লিখি, নিবিড় অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বিজলি-রঙের প্লেন-পাখার মেঘচ্ছায়া নীলান্তরে লক্ষ্য করি। সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, স্পন্দিত নক্ষত্রাকাশ এরোপ্লেনে নবতর মূর্তি নেয়...’।২ তাঁর মতে রবীন্দ্রনাথের লেকায় ‘যন্ত্রপাতির প্রত্যক্ষ পরিচয়’ বিশেষ না থাকার কারণ ‘বোধ হয় টেক্‌নলজির প্রথম অধ্যায় যে কলকারখানা, দানব-শহর, এবং সংহারী–যুগের অতিকায় নির্মম বিলাস তিনি দেখেছিলেন তার প্রতি বিরুদ্ধতা তাঁকে সমস্ত টেক্‌নিকাল ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সন্দিহান করেছিল।’ এছাড়া এই ‘স্বাভাবিক যন্ত্রবিরুদ্ধতা’র মূলে ছিল ‘বিদেশীদের হাতে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার— লক্ষ লোক মারবার বৈজ্ঞানিক বিধি’।৩

কিন্তু এর সম্পূর্ণ আলাদা একটা মাত্রাও ছিল, সেটাকে বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ও নৈতিক মাত্রা বলা চলে। ১৯৩২ সালে পারস্যে (ইরানে) গিয়ে, পৃথিবীর মাটি থেকে অনেক উঁচুতে, ‘যেখানে ধরনীর সঙ্গে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের যোগ সংকীর্ণ, সেখানে ‘বায়ুতরী’ থেকে বোমা ফেলে মানুষ মারার দুর্ধর্ষ প্রযুক্তি-সাফল্য দেখে; ‘ব্রিটিশদের আকাশফৌজে’র ‘খ্রীষ্টান ধর্মযাজক’দের কাছে পারস্যের ‘কোন শেখদের গ্রামে তারা প্রতিদিন বোমা বর্ষণ’ করছে তার হৃষ্ট ফিরিস্তি শুনে, তাঁর মনে হয়েছিল এই ‘এমন অবস্থায়’ কথাটার তাৎপর্য দূরপ্রসারিত। বাস্তবিক, দূর থেকে ‘রিমোট’ সুইচ টিপে কিংবা

> এমন অবস্থায় আকাশযানের থেকে মানুষ যখন শতঘ্নী বর্ষণ করতে বেরোয় তখন সে নির্মমবাবে ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; যাদের মারে তাদের অপরাধের হিসাবোধ উদ্যত বাহুকে দ্বিধাগ্রস্ত করে না, কেননা হিসাবের অঙ্কটা ঝাপসা হয়ে যায়। যে বাস্তবের ‘পরে স্বাভাবিক মমতা, সে যখন ঝাপসা হয়ে আসে তখন মমতারও আধার যায় লুপ্ত হয়ে।৪

অনেক উঁচু থেকে বোমা ফেলে অনেকমানুষ মারার এই প্রক্রিয়ার একটা ‘সুবিধা’ হল লক্ষ্যবস্তু থেকে হত্যাকারীর নৈর্ব্যক্তিক দুরত্ব; কাকে মারছি তার মুখ দেখতে হচ্ছে না। ঝাপসা হয়ে আসা সেই বাস্তবতা আনে এক ধরনের দার্শনিক নির্লিপ্ততা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্দের সময় এ প্রক্রিয়া খুব কার্যকর হয়েছিল; যার চরম পরিনতি হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসকান্ড। রবীন্দ্রনাথের সৌভাগ্য, বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সে ‘সাফল্য’ (অনেকে যাকে গীতানুরাগী ‘ওপেনহাইমারের পাপ’ বলেন) তাঁকে দেখতে হয়নি। ‘অস্ত্রশস্ত্রের নিয়ন্ত্রন ও দিক্‌নির্দেশের ব্যাপারে’ ইলেকট্রিক বোতাম টেপা দূর-নিয়ন্ত্রন পদ্ধতির প্রয়োগের তাৎপর্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরে জে ডি বার্নাল লিখেছিলেন, এর ‘আসল উদ্দেশ্য হল সাক্ষাৎ সংঘর্ষের ক্ষেত্র থেকে মানুষের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিকে আরও দূরে সরিয়ে আনা। ... ক্রিয়া ও তার পরিনামের মধ্যে দূরত্বটা খুব বেশি হওয়ার আধুনিক যুদ্ধপ্রক্রিয়া দায়িত্বজ্ঞানহীনতাকেই প্রশ্রয় দেয়। আগেকার যুদ্ধের সচেতন নিষ্ঠুরতার সঙ্গেই পাল্লা দেয় আধুনিক যুদ্ধের এই নির্বিকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতা। আজকের বোতাম টেপা যুদ্ধপ্রক্রিয়ার কল্যানে সুবুদ্ধিসম্পন্ন, আপাত সুসভ্য কোনও ব্যক্তির পক্ষেও অনায়াসেই চরম বীভৎস মারণযজ্ঞের আয়োজন করা সম্ভব– যার ফলাফল তিনি অকুস্থলে স্বচক্ষে দেখতে পান না।’৫ ইদানীং কালে ইরাক যুদ্ধে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বীভৎস ‘সাফল্য’ এ কথার সত্যতার প্রমান। মানুষ নিধনের প্রত্যক্ষ ভয়াবহতা থেকে নিধনকারীকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে যুদ্ধপ্রক্রিয়া যে একটা গুনগত পার্থক্য দেখা দিয়েছিল, সেটা রবীন্দ্রনাথ অভ্রান্ত প্রত্যয়ে ধরতে পেরেছিলেন। এরোপ্লেন জিনিসটাকে তিনি সেই মারণ-অনুষঙ্গে দেখেছিলেন। তাঁর কাছে প্রশ্নটা নিছক হিংসা-অহিংসার নয়, হণ-নিধন করে মানুসের মন কী করে নরেন্দ্র মোদীর মতো নির্বিকার থাকতে পারে, সেই নৈতিকতার—

> পাশ্চাত্য হননবিদ্যা যারা জানে না তাদের মানবসত্তা আজ পশ্চিমের অস্ত্রীদের কাছে ক্রমশই অত্যন্ত ঝাপসা হয়ে আসছে।

এই আধুনিক, দূর-নিয়ন্ত্রিত ত্ত্বত্র— ত্বা যুদ্ধপ্রক্রিয়ার (যার প্রায় কিছুই তিনি দেখে যাননি) নির্বিকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পিছনে যে-মন কাজ করে; কিংবা বলা যায়, সেইমন যেভাবে এই দানবিকতার যৌক্তিকতা খুঁজে নেয়, তার দার্শনিক সমান্তরাল তিনি খুঁজে পান ভগবদ্গীতায় উপস্থাপিত শ্রীকৃষ্ণর যুক্তিতে।

গীতা রবীন্দ্রনাথের দোলাচল

গীতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের দোলাচল অবশ্য নতুন নয়। গীতার যা প্রাণ, সেই আত্মার অবিনশ্বরত্ব-তত্ত্ব সম্পর্কিত উপদেশ নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন অনেক কাল আগে ১৯০৮ সালে। স্বদেশী আন্দোলনের খরতা থেকে সরে আসার বছর তিনেক পরে তাঁর মনে হয়েছিল গীতার দর্শন আসলে যেকোনো মূল্যে কার্যসিদ্ধির সংকীর্ণ সাময়িক দর্শন। গীতা মানবসত্তাকে, মানুযের ভালোমন্দের বোধকে, এককথায় মানবিক নৈতিকতাকে, সম্পূর্ণ ঝাপসা করে দেওয়ার তাৎক্ষনিক কেজো ক্লোরোফর্ম মাত্র, ক্লোরোফর্ম-এর মতোই ফলদায়ক। স্বদেশী বিপ্লবীদের হিংসাশ্রয়িতার তত্ত্ব-প্রেরণা হিসাবে গীতার ভূমিকা তাঁর কাছে অজানা ছিল না। ৩১ মে ১৯০৮ অজিতকুমার চক্রবর্তীকে লিখেছিলেন, ‘অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করবার জন্যে আত্মার অনশ্বরত্ব সম্বন্ধে যে উপদেশ আছে তার মধ্যেও বিশুদ্ধ সত্যের সরলতা নেই।’৬

কিন্তু এর ঠিক দুবছর পরে, ১৯১০ সালের ২৩ মে তিনি লেখেন

একতাল এত হুজুগের মধ্যেও আমি গীতা পড়িনি– কারণ তখন আমার পড়ার সময় হয়নি, এখন সময় বুঝেই সময়ের কর্ত্তা আমার হাতে এই বইখানি তুলে দিয়েছেন। তার সঙ্গে যোগমুক্ত হবার জন্যে মনকে যে একটি অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্যের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তার সত্যতা বুঝতে পারছি। ... এই যে সামঞ্জস্য এ তো বাইরের জিনিষ নয়– নিজের অন্তরের মধ্যে সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত লোকে অধিরোহণ করতে হবে— ভিতরকার সমস্ত বিরোধ নিঃশেষে না মেটালে নয়, এই জন্যেই বাইরের বাধার দ্বারা পদে পদে তার পরীক্ষার প্রয়োজন হচ্ছে। ঈশ্বর কবে এই পরীক্ষা থেকে আমাকে উত্তীর্ণ করবেন? কবে তিনি আমার সমস্ত ভাঙাকে জোড়া দিয়ে নেবেন?

তাঁর কাছে গীতা এখন আর তাৎক্ষনিক কার্যদ্ধারের ক্লোরোফর্ম নয়, তার 'চিরন্তন' মূল্যের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। আঘাত-সংঘাত থেকে সরে এসে 'অতি গভীর শান্তি ও সামঞ্জস্য' লাভের চির-প্রতিষ্ঠিত পথ হিসেবেই (স্মরণীয় গীতালির 'দুঃখ এ নয়, সুখ নহে গো, গভীর শান্তি এ যে') এখন তিনি গীতার বাণীতে অভিভুত। 'এতকাল এত হুজুগ' কথার তাৎপর্য কী? চিঠিলেখা ১৯১০-এ। অরবিন্দ পোদ্দার লক্ষ করেছেন, স্বদেশী নেতারা ঐ সময়ে একের পর এক অনেকেই আত্মমুখ অন্য সুরে গান গেয়েছেন। '১৯০৯ সালে কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর অরবিন্দ ঘোষ জনসমষ্টিকে বিমূঢ় এবং দেশের সর্বত্র একটা অস্বস্তিকর নিস্বব্ধতা দেখতে পান। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর এই মানসিক বোধ আর কিছুই নয়, প্রতক্ষ্য রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণ ও পরিশেষে অধ্যাত্ম সাধনায় নিমগ্ন হওয়ার পূর্বাভাস মাত্র।' অনুরুপভাবে 'বিপিনচন্দ্র পাল ইংল্যান্ডে পাড়ি দেবার ছাড়পত্র গ্রহণ করেন, এবং সেখানে ১৯১১ সনে ঘোষণা করেন, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীন সমমর্যাদা সহ আত্মনিয়ন্ত্রের অধিকারই হলো ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খার সর্বোত্তম সমাধান।'৮ ১৯১০ সালের বিখ্যাত 'তপোবন' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও গীতা উদ্ধৃত করে বললেন—

ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, আবার মনের চেয়ে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধির চেয়ে যা শ্রেষ্ঠ তা হচ্ছেন তিনি। ... এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।'৯ তাই ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।... সেই অনুশাসনকে আজ যদি আমরা বিস্মৃত না হই, আমাদের সমস্ত শিক্ষাদীক্ষাকে সেই অনুশাসনের যদি অনুগত করি, তবেই আমাদের আত্মা বিরাটের মধ্যে আপনার স্বাধীনতা লাভ করবে এবং কোনো সাময়িক বাহ্য অবস্থা আমাদের সেই স্বাধীনতাকে বিলুপ্ত করতে পারবে না।১০

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে 'সময় বুঝেই সময়ের কর্ত্তা আমার হাতে এই বইখানি তুলে দিয়েছেন' এই ঘোষনার মোহমুক্তি তাৎপর্য পরিষ্কার হয়ে যায়।

কিন্তু 'সময়ের কর্ত্তা'র এই সময়োপযোগী আবির্ভাব সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের বিক্ষুব্ধ মনে স্থায়ী শান্তির প্রলেপ লাগাতে পারেনি। কেননা এখানে সত্য কেবল এটুকুই যে সংশয় ঝেড়ে ফেলে 'শান্তি ও সামঞ্জস্যে' পৌঁছনোর আপ্রাণ সাধনা করছেন তিনি; বাকি সমস্তটুকুই তাঁর আকাঙ্খা, যা ভবিষ্যৎকালে পূর্ণ হবে বলে তাঁর আশা। সে আশা পূর্ণ হয়েছিল কি? ভাঙা বিশ্বাসে জোড়া লেগেছিল কি? বোধহয় কোনোদিনই লাগেনি। ১৯১৯ সালে প্রগাঢ় গীতা-ভক্ত গান্ধিজী এবং চিত্তরঞ্জন দাশ উভয়েই যেভাবে সরকারি দমননীতির কেজো দোহাই দিয়ে জালিয়ানওয়ালাবাগ -হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ থেকে বিরত থাকেন, সেটা হতবাক করে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছা অবসৃত কবি রবীন্দ্রনাথকে। চিত্তরঞ্জন দাশকে তিনি এমন প্রস্তাবও দিয়েছিলেন যে সময়দানে প্রতিবাদ সভা ডাকা হোক, রবীন্দ্রনাথ নিজে সভাপতিত্ব করবেন। তিনি জানতেন, সেটা করলে কারাবাস অবধারিত। তবু রাজনীতি-জগতের ভবি ভোলেননি। নিষ্কাম ফলাকাঙ্ক্ষাহীনতার আদর্শকে কত সুবিধাবাদী রূপ দেওয়া যায়, তার এই করুণ পরিচয় একক প্রতিবাদে উদ্বুদ্ধ করেছিল কবিকে।

তাই ১৯০৮ সালে গীতা সম্বন্ধে ব্যক্ত সংশয় যে অন্তবর্তী ভক্তিপর্ব পেরিয়ে ১৯৩২-এ আরো তীক্ষ্ণ, আরো দ্বিধাহীন বিদ্রুপবর্ষী ভাষারূপ নিয়ে ফিরে আসবে, তার মধ্যে আশ্চর্যের কিছু নেই। ইরানে উড়োজাহাজ থেকে নীচের মানুষদের ওপর ব্রিটিশ বোমারুর 'এফিশিয়েন্ট' বোমাবর্ষণ নির্বিকার অমানবিকতার কথা বলার পরেই তিনি বলেন—

গীতায় প্রচারিত তত্ত্বোপদেশও এই রকমের উড়ো জাহাজ – অর্জুনের কৃপাকাতর মনকে সে এমন দুরলোকে নিয়ে গেল, সেখানে থেকে দেখলে মারেই বা কে, মরেই-বা কে, কেই-বা আপন, কেই-বা পর। বাস্তবকে আবৃত করবার এমন অনেক তত্ত্বনির্মিত উড়োজাহাজ মানুষের অস্ত্রশালায় আছে, মানুষের সাম্রাজ্যনীতিতে, সমাজনীতিতে, ধর্মনীতিতে। সেখান থেকে যাদের উপর মার নামে তাদের সম্বন্ধে সান্তনাবাক্য এই যে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।১১

স্পষ্টত, সরল কোন নয়, সূক্ষ্ম, এমনকি কখনো কখনো রীতিমতো স্থূল কোণ থেকেও গীতার দর্শনকে বিচার করার এই ধারাটা তাঁর মনের গহনে বরাবরই রয়ে গিয়েছিল। তাই হিন্দু দার্শনিক প্রজ্ঞার সারাৎসার বলে যা বহুজনমান্য, তাকে নিছক বোমা-ক্লিষ্টদের মন ভোলাবার 'সান্তনাবাক্য' বলেন তিনি। বোমারুদের মানবিকতা-বিচ্ছিন্ন নির্লিপ্ততার তত্ত্ব আখ্যা দেন। ফলত যেচে ধর্মপ্রান হিন্দু ভারতবাসীর দেওয়া কলঙ্ক মাথা পেতে নিতে এতটুকু দ্বিধান্বিত নয় তাঁর মন।

(এ বিষয়ে আরো বিশদ ও গভীর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য ট্টথদ্বদ্ধ্হ্স্ত খ ক্ষঙ্খঠ্ঠথত্বঙ্খন্দাখৃ ট্টত্রঙ্খন্ত্রথত্থ— ট্টথত্ব— ত্মন্খ— থঠ্ঠন্তন্খ—ঠন্খডত্রদ্ধঙ্খত্রন্ত—ঠঁঝঞ্জট্টক্ষ্ম্ষ্ট ছঞ্জথক্ষজঙ্খছক্ষচঞ্জট্টজ্রঙ্গৃ ঞ্জত্রন্দ্র ঙ্গঔক্কক্ষ (খঙ্খ ২০১৩. দ্মদ্ম ৬৬ঙ্খ৭৪ৃ

সূত্রনির্দেশ

১) নরেশ গুহ, সম্পা, কবির চিঠি কবিকে, প্যাপিরাস, কলকাতা ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৫২।
২) নরেশ গুহ, সম্পা, প্রমথ চৌধুরীকে লেখা অমিয় চক্রবর্তীর পত্রাবলী, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আক্স কাদেমি, কলকাতা ২০০০, পৃষ্ঠা ৩৩।
৩) ঐ, পৃষ্ঠা ৩২।

৪) রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিকী সংস্করণ, প ব সরকার, ১০৭৫৪।
৫) জে ডি বার্ণাল, ইতিহাসে বিজ্ঞান (অনু. আশীষ লাহিড়ী), আনন্দ, কলকাতা ২০০৫, পৃষ্ঠা ৪৭২।
৬) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা), ভক্ত ও কবি অজিতকুমার চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৪।
৭) রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পা), ভক্ত ও কবি পৃষ্ঠা ৬২।
৮) অরবিন্দ পোদ্দার, রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, প্রত্যয় (১৯৮২), কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা ১৪০।
৯) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১১৬০২-৩।
১০) রবীন্দ্র রচনাবলী,, ১১৬০৬।
১১) রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০৭৫৪।

যুক্তিবাদের আলোকে মতুয়া ধর্ম

নকুল মল্লিক

ধর্মতত্ত্বের ভিতর পরিপূর্ণ যুক্তিবাদের অবস্থান মেলে না। পৃথিবীর সকল ধর্মের স্বাতন্ত্র বা বৈশিষ্ট্য আমাদের জ্ঞাত নয় তবে ভারতীয় ধর্মের ভিতর বৌদ্ধধর্ম, যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রেও বিতর্কের অবকাশ আছে। ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরমব্রহ্ম, ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে তথাগত বুদ্ধ নীরব ছিলেন বলে তাঁকে যুক্তিবাদী বলতে আর দ্বিধা থাকে না। এমন একটি ধর্মের সাদৃশ্য দৃষ্ট হয় ঠাকুর হরিচাঁদ প্রবর্তিত মতুয়া ধর্মে। এই ধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রী শ্রী হরিলীলামৃত পুস্তকে এ বিষয়ে উল্লেখিত আছে—

''বুদ্ধের কামনা তাহা পরিপূর্ণ জন্য।
যশোবন্ত গৃহে হরি হৈল অবতীর্ণ।।''

মতুয়া ধর্মের সামগ্রিক সত্তাকে যদি সঠিক মূল্যায়ণ করা যায় তবে অকপটে স্বীকার করা যায় মতুয়া ধর্ম—
মানবিক ধর্ম, গার্হস্থ্য ধর্ম, সমাজ রূপান্তরের ধর্ম, গণমুক্তির ধর্ম, প্রতিবাদী ধর্ম, জ্ঞান-ভক্তি ও কর্মের সমন্বয়ের ধর্ম, আত্মোন্নয়ন ও আত্মজাগরণের ধর্ম, চারিত্রিক সংযম সাধনার ধর্ম, শ্রেনী-বর্ন বিভেদহীন ধর্ম, দেব-দেবী-যাগ-যজ্ঞ-তন্ত্র-মন্ত্র শূণ্য ধর্ম, নারী মর্যাদার ধর্ম।

এই ধর্ম পালনের জন্য কোন দীক্ষা বা গুরুভজনার প্রয়োজন নেই, আছে কেবল ঠাকুরের দ্বাদশটি সহজ সরল নির্দেশিকা, যা সমাজের অতি সাধারণ স্তরের মানুষ অতি সহজে পালন করতে পারে।

১) সদা সত্য কথা বলা। ২) পরস্ত্রীকে মাতৃ জ্ঞান করা। ৩) পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি করা। ৪) জগৎকে প্রেমদান করা। ৫) পবিত্র চরিত্র ব্যক্তির প্রতি জাতিভেদ না করা। ৬) কারও ধর্ম নিন্দা না করা। ৭) বাহ্য অঙ্গ সাধু সাজ ত্যাগ করা। ৮) শ্রী হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করা। ৯) ষড় রিপুর নিকট থেকে সাবধান থাকা। ১০) হাতে কাম মুখে নাম করা। ১১) দৈনিক প্রার্থনা করা। ১২) ঈশ্বরে আত্মদান করা।

একজন নিপুণ পাঠকের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তিনটি নির্দেশিকা যুক্তিবিচারে প্রতিহত হতে পারে। শ্রীহরিমন্দির প্রতিষ্ঠা অর্থে কোন যুক্তিবিহীন ভক্তিবাদের কথা নেই। হরি বলতে বৈকুণ্ঠের হরিকে স্মরণ করা হয়নি। মতুয়া ভাবাদর্শে ব্যক্ত হয়েছে— সবকিছু হরণ করে তারে বলি হরি। সব বলতে দেহের জড়তা আর হৃদয়ের মলিনত্ব যার মাধ্যমে দূরীভূত হয়। ন্যায়পরায়নতা, সংযম, নিষ্ঠা, চরিত্রের দোষগুলিকে দূরীভূত করতে পারে সম্পূর্ণভাবে। এই গুণত্রয়ের সম্মিলিত শক্তিকেই যথার্থ ভাবে হরি বলা হয়েছে। দৈনিক প্রার্থনা অর্থে কোন দেবদেবীর কাছে আত্মনিবেদন নয়, অত্যুন্নত জীবন চর্চায়, যাতে সর্বাঙ্গ সুন্দর মনুষ্যত্বের বিকাশ ঘটে তার নিরন্তর অনুশীলনকেই প্রার্থনা বলা হয়েছে। সবশেষে ঈশ্বরে আত্মদান বুঝতে ভগবান বা গড্‌কে আত্মদান নয়। মতুয়া ধর্মে ঈশ্বরের ব্যাখ্যাই স্বতন্ত্র।

''যে যাহারে ভক্তি করে সে তার ঈশ্বর।

ভক্তিযোগে সেই তার স্বয়ং অবতার।।”

পুত্র যদি পিতাকে ভক্তি করে, ছাত্র যদি শিক্ষককে ভক্তি করে, ভগ্নী যদি ভ্রাতাকে ভক্তি করে, স্ত্রী যদি স্বামীকে ভক্তি করে। তার কাছে স্বামীই ঈশ্বর। এই তত্ত্বে নাম বিভ্রাট ভিন্ন যুক্তিতর্কের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তথাগত বুদ্ধেরও এমন ত্রয়োদশ নির্দেশিকা পেয়েছি— পঞ্চশীল অষ্টমার্গ যা পরিপূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য।

এখন আলোচ্য বিষয় মতুয়া ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বা বিশেষত্ব কোথায়? দুইশত বৎসর পূর্বের গ্রামীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ঠাকুর হরিচাঁদ উপলব্ধি করেছিলেন— ব্রাহ্মন্যবাদ বলতে বা মনুবাদ সমাজের ঐক্য ও সংহতির প্রতিবন্ধক। ব্রাহ্মণ্যবাদ বলতে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে বুঝায় না। যে ভাবনা অসাম্য, বিভেদ ও শোষণকে প্রশ্রয় দেয় সেই ভাবনার উৎসমুখ ব্রাহ্মণ লিখিত মনুসংহিতা। তাই এই ভাবনাকে বা শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে ব্রাহ্মণ্যবাদ স্বীকার করে গেছেন—

ঠাকুর হরিচাঁদ হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলেই অভিহিত করেছেন কিন্তু বেদবিধির বিরুদ্ধেই তাঁর জ্বলন্ত প্রতিবাদ। অনেকক্ষেত্রে মনুবাদী অনুশাসনের বিপরীত প্রক্রিয়াই তিনি গ্রহণ করেছেন, সে ক্ষেত্রে ভক্তিবাদ অপেক্ষা যুক্তিবাদই তাঁর কাছে শ্রেয়তর হয়ে উঠেছে। মনুবাদীরা যখন জীবন চর্যায় চতুরাশ্রম— ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ, সন্ন্যাসের কথা বলছেন তখন ঠাকুর মন্তব্য করেছেন— একটি আশ্রমের মধ্যে সমস্ত আশ্রম নিহিত আছে তা হল প্রশস্ত গার্হস্থ্য আশ্রম।

“প্রশস্ত গার্হস্থ্য ধর্ম জীবে শিক্ষা দিতে
হরিচাঁদ অবতীর্ণ হন অবনীতে।।”

ঠাকুর হরিচাঁদ গার্হস্থ্য জীবন সাধনার একনিষ্ঠ অনুরাগী, সংসার ত্যাগকে তিনি কোন ক্ষেত্রেই মেনে নিতে পারেননি। সমাজ সংসারের সকল প্রকার দায়-দায়িত্ব যথাযথ পালনের মধ্যেই ধর্মসাধনা করার নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। সন্ন্যাস বা বৈরাগ্যকে তিনি কোন ক্রমে মেনে নিতে পারেননি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন—

“বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।।”

ঠাকুর বলেছেন— গার্হস্থ্য জীবনেই ধর্ম ও কর্মের সমন্বয় ঘটাতে হবে। সংসারে পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পুত্র, কণ্যা ও আত্মীয় পরিজনদের প্রতি সকল দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই ধর্মচর্চা করতে হবে। তিনি গার্হস্থ্য ধর্মের পবিত্রতা রক্ষা করাকে অত্যন্ত উচ্চে স্থান দিয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবন চর্যার মাধ্যমেই সাধারণ থেকে অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মাটির কাছাকাছি থাকা যায়। তাই ঠাকুর ব্যক্ত করেছেন—

“মানুষে আসিয়া মানুষে মিশিয়া
করিব মানুষ লীলা
সেই তো সময় পাইবে আমায়
পুনশ্চ মানুষ হলে।।”

হিন্দুধর্ম বলছে— বীর্য্য ধারনং ব্রহ্মচর্য্যম্।
দেহের সর্বোত্তম শক্তি হল বীর্য্য। তাকে যথাযথ রক্ষা করতে পারলেই জীবন সাধনায় উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তাকে রক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায়, নারী সঙ্গ থেকে দুরে থাকা। বীর্যপাত মৃত্যুর সমান, তাতে সাধন মার্গের বিঘ্ন ঘটে অতএব পরমতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে নারীস্পর্শ থেকে দুরে থাকা বাঞ্চনীয়।

ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

“একনারী ব্রহ্মচারী পালো গৃহধর্ম।
গৃহধর্ম নষ্ট হলে, নষ্ট সব কর্ম।”

অর্থাৎ জীবনে একজন মাত্র নারী নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যদি সংযত জীবনযাপন করা যায় তাতে ব্রহ্মচর্য অক্ষয় থাকে। সংসার জীবনে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে যদি সংযত ও পরিশীলিত জীবনযাপন করে, গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করা যায় তাতেই ব্রহ্মচারী হওয়া যায়। সবাই যদি নারীসঙ্গ ত্যাগ করে তবে বিশ্বায়ণ সংসার বিলুপ্ত হয়ে যায়।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর কাব্যে—

“ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন
সে নহে আমার,
যে কিছু আনন্দ আছে দৃশ্যে গন্ধে গানে
তোমার আনন্দ রবে তার মাঝখানে।
মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বালিয়া।
প্রেম মোর ভক্তিরুপে রহিবে ফলিয়া।।”

হিন্দুদের মনুসংহিতায় উল্লেখ আছে—

‘স্বভাব এষ নারীনাং নরানামিহ দূষনম’ অর্থাৎ মনুষ্যদিগকে কলঙ্কিত করাই নারীর স্বভাব। নারী নিজের সৌন্দর্য্যের প্রলোভন দেখিয়ে সর্বক্ষণ পুরুষকে উন্মত্ত ও বিভ্রান্ত করে। নারী নরকের দ্বার। নারীর সংসর্গেই পুরুষ উচ্ছন্নে যায় অতএব ‘পথি নারী বিবর্জিতা’। গমনাগমনের পথেও নারীকে বর্জন করা শ্রেয়। নারী কেবল পুরুষের ভোগ্যবস্তু, সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র ভিন্ন কিছু নয়। নারী, পুরুষের সাধনপথের প্রতিবন্ধক, ধর্ম চর্চায় তাকে সঙ্গী করা চলে না। সংসারে নারী, পুরুষের সেবাদাসী হয়ে থাকবে। ঠাকুর হরিচাঁদ এই ভাবনার বিপরীত কথাটাই বলেছেন—

“করিবে গার্হস্থ্য ধর্ম লয়ে নিজ নারী।
গৃহে থেকে ন্যাসী বানপ্রস্থী ব্রহ্মচারী।।”

অর্থাৎ স্ত্রী স্বামীর দাসী নয় বরং তার ধর্ম ও জীবনসঙ্গিনী। মানব সংসারে উভয়ের মর্যাদা সমান।

ধর্মে, কর্মে নারীকে শ্রদ্ধাসহকারে সঙ্গী করতে হবে, সম্মান জ্ঞাপন করতে হবে কেননা সংসারে নারী কেবল স্ত্রী নয়, সে কখনও মাতা, কখনও ভগিনী, কখনও বা কণ্যা। ঠাকুর নারী-মুক্তি আন্দোলনের একজন পথিকৃৎ। তাঁর ভাবনায় সহমতও পোষণ করেছেন নজরুল ইসলাম—

''বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যানকর,
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্দ্ধেক তার নর।।"

তবে ঠাকুর একটা বিষয় খুব সাবধান করে দিয়েছেন— নারীসঙ্গ যেন কখনও ব্যভিচারিতায় পরিণত না হয়, তার প্রতি যেন মন্দ দৃষ্টি কখনও আরোপিত না হয়—

''পর পতি পর সতী স্পর্শ না করিবে।
না ডাকো হরিকে, হরি তোমারে ডাকিবে।।"

পরস্ত্রীর প্রতি মাতৃবৎ আচরণ করবে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। চারিত্রিক সততা, সংযম, দৃঢ়তা যদি অত্যুন্নত হয় তবে ঈশ্বর আরাধনার প্রয়োজন হয় না। চরিত্রবান ব্যক্তিকে সমাজ সকলে সমীহ করে। তাকে কারও কাছে মাথা নিচু করে চলতে হয় না, সে অকপটে সত্য বা ন্যায় কথা বলতে ভয় পায়না। হিন্দুধর্ম শুনিয়েছে— গুরু কৃপাহি কেবলম্। জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে হলে একজন সদ্‌গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। দীক্ষা লাভের পর তীর্থভ্রমন বিধেয়। গয়া, কাশী, বৃন্দাবনের পবিত্র মৃত্তিকার স্পর্শ সুখের সমান। পারমার্থিক সাধনার নির্বিকার লক্ষ্য ভববন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। জগৎ দুঃখময়, এই দুঃখের কারাগারে যেন বারে বারে না আসতে হয় তার জন্যই মুক্তিলাভের স্পৃহা। ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

''দীক্ষা নাই করিবে না তীর্থ পর্যটন।
মুক্তি স্পৃহাশূণ্য নাই সাধন ভজন।।"

মতুয়া ধর্মে দীক্ষা দান ও গ্রহনের প্রথা নিষিদ্ধ। তীর্থ্মনের কোন উপযোগিতা নেই, মুক্তিলাভের স্পৃহা অত্যন্ত স্বার্থপরতার লক্ষণ। মনুবাদীদের অধ্যাত্মবাদটিকে আছে ইহ জগতের উর্দ্ধে পরজগতের সর্বশক্তিমান অধীশ্বরের অস্তিত্বের উপর। উপযুক্ত গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধন ভজন করলে তাঁকে পাওয়া যায়। ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বর প্রাপ্তিতে মতুয়াদের কোন আকাঙ্খা নেই, ব্যক্তিমুক্তি নয়, গণমুক্তিই কাম্য। মতুয়া ধর্ম পারলৌকিক মোক্ষ লাভের ধর্ম নয়, ইহলৌকিক সাংসারিক জীবন সাধনার ধর্ম। এই ধর্ম মানব প্রেম বিশ্ব প্রেমের ধর্ম গুরুর কাঝ থেকে কানে বীজমন্ত্র নিয়ে দেহশুদ্ধিতে বিশ্বাস করে না, স্বর্গাভ এক অলীক কল্পনা মাত্র। মনুষ্যত্বলাভই জীবনের উদ্ধেশ্য। একজন খাঁটি মতুয়া আত্মকেন্দ্রিক হতে পারে না। তাঁর কর্ম ও ভাবাদর্শ হবে— বহুজনহিতায়, বহুজন সুখায়। ঠাকুরের ভাবনার প্রতিফলন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের ধুলামন্দির কবিতায়—

''মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে!
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন পরে বাঁধা সবার কাছে
রাখো রে ধ্যান, থাকরে ফুলের ডালি,
ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি—
কর্মযোগ্য তাঁর সাথে এক হয়ে ঘর্ম পড়ুক ঝরে।।"

হিন্দু ধর্ম বলছে— দীক্ষা নিয়ে মালা তিলক চন্দন গ্রহণ কর। তন্ত্র, মন্ত্র, ভেক, ঝোলা অবলম্বন কর, তিথি নক্ষত্র অনুসারে খাদ্য নির্বাচন কর, বৈরাগী হয়ে ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ কর, স্বপাক অন্ন ভোজন কর, সাধুতার নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গের বেশভূষা পরিবর্তন কর, যাতে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ঠাকুর বললেন—

''তন্ত্র, মন্ত্র, ভেক, ঝোলা সব ধাঁধাঁবাজি
পবিত্র চরিত্র রেখে হও কাজের কাজী।
মালা টেপা ফোঁটা কাটা জল ফেলা নাই
হাতে কাম মুখে নাম মন খোলা চাই।।"

অর্থাৎ তন্ত্র, মন্ত্র, যাগ, যজ্ঞ সবই মানুষকে ফাঁকি দেবার কৌশল, সবই অহেতুক। মন্ত্রে মানুষের পাপ দূর হয় না। মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। আত্মা যদি থেকেও থাকে তার সদ্‌গতি কখনও তন্ত্র, মন্ত্র যাগ, যজ্ঞ করতে পারে না। মতুয়া মতে মানুষের হৃদয়ের সচ্ছতা, কর্মের ও চরিত্রের সততাই মুখ্য শক্তি। হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মানুষের সহজাত সত্ত্বাকে দুর্বল করে দিয়েছে, মতুয়া ধর্মে কোনো দেব-দেবীর আরাধনাকে স্বীকার করা হয় না। ধর্মে দেবতাকে উদ্দেশ্য করে তন্ত্র, মন্ত্র, ভেল্কি দেখিয়ে পুরোহিত সমাজ মানুষের হৃদয়ের দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দেয়, তার প্রতিবাদী সত্ত্বাকে বিনষ্ট করে। মতুয়া ধর্মে আছে— গভীর কর্মসধনা, ধর্ম ও কর্মের সমন্বয়, আছে শ্রমের মর্যাদা। মনুসংহিতায় আছে—

''ব্রাহ্মণো জায়মানোহি পৃথিব্যাস্ অধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষল্য গুপ্তয়ে।।"

ব্রাহ্মণ জন্মগত ভাবেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ এবং ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য সকল জীবের প্রভু বলে বিবেচিত হন অর্থাৎ ব্রাহ্মনের জন্ম হয়েছে পৃথিবীকে শাসন করার জন্য। ব্রাহ্মণ, দেবতার প্রতিনিধি তারা আশীর্বাদ করতে পারে অভিশাপও দিতে পারে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দেবতার মত ভক্তি করা বাঞ্চনীয়, তাঁদের ভক্তিযুক্তভাবে সেবা করলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব, সামজের শিরোমনি। ঠাকুর বিপরীত কথাই বলেছেন—

''কোথায় ব্রাহ্মণ দেখ কোথায় বৈষ্ণব।
স্বার্থবশে অর্তলোভী যত ভন্ড সব।।"

সমাজে যথার্থ ব্রাহ্ম বৈষ্ণবের সন্ধান পাওয়া যায় না, তারা প্রায় সবাই ভন্ড, অর্থলোবী, স্বার্থপর। শাস্ত্রে বলেছে 'ব্রহ্মজানাতিযঃ সঃ ব্রাহ্মণঃ। ব্রহ্মের স্বরূপ কী তা সঠিকভাবে ব্যাখ্যাত হয়নি কোথাও। অধ্যাত্মবাদীরাই ব্রহ্মচর্চা করেন। এই অধ্যাত্মবাদ আর একপ্রকার ধোঁয়াশা।

বৈষ্ণবতত্ত্বের ব্যাখ্যায় একজন আদর্শ বৈষ্ণবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হবে তৃণাদপি সুনীচেন, মৃদানি কুসুমাদপি অর্থাৎ তাঁর চারিত্রিক স্বভাব হবে বিনীত ও নিরহঙ্কারী, তৃণ অপেক্ষা নিচু এবং কুসুম

অপেক্ষা কোমল কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বিপরীত। তারা ষড়রিপু জয় করতে পারে না। ক্রোধ অগ্নিশর্মা হয়ে অশোভন বাক্য প্রয়োগ করে, ব্রাহ্মণকে যে দৃষ্টিতে দেখে, শূদ্রকে সে দৃষ্টিতে দেখেনা। ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণব বৈষ্ণবীদের ভিতর অনেক ক্ষেত্রে ব্যাভিচারিতা বা চারিত্রিক অবনতিও ঘটেছে। তারা সমাজকে কলঙ্কিত করেছে। বৈষ্ণব ধর্মের যথার্থ মর্যাদা তারা রক্ষা করতে পারেনি।

এই প্রসঙ্গে বাবা সাহেব আম্বেদকার বলেছেন—

''ব্রাহ্মণরা দেবদেবীর স্রষ্টা। দেবদেবীর মূর্ত্তিকে সাক্ষীগোপাল হিসাবে দাঁড় করিয়ে কৌশলে চলছে ব্রাহ্মণশ্রেনীর অবাধ লুণ্ঠন। ব্রাহ্মণ্যবাদই নির্যাতিত শ্রেনীর দুঃখ, দুর্দশা ও সামাজিক নিপীড়নের মূল কারন। ব্রাহ্মণ্যবাদ থেকে অস্পৃশ্যতার জন্ম। আজ প্রয়োজন সমস্ত নির্যাতিতা ও বঞ্চিত শ্রেনীর মানুষের একত্রিত হয়ে ভারতের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল উৎপাটন করে ফেলা অন্যথায় তারা মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবেন না।''মনুবাদীরা বলছেন— যথার্থ ধর্মচর্চা যদি করতে হয়, ঈশ্বরলাভ যদি আকাঙ্ক্ষী থাকে তবে সমাজ সংসারের কোলাহলে নয় নিভৃত নির্জনে এককভাবে সাধনা করতে হয়। পাহাড়, পর্বত, গুহা অথবা জঙ্গলে নিরুপদ্রব শান্ত পরিবেশে পরমেশ্বরের স্মরণে ধ্যানমগ্ন হতে হবে। তাই দেখা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন পাহাড় বা পর্বতের শীর্ষদেশে নানাবিধ বেদমন্দির বা উপাসনালয়ের অবস্থান।
ঠাকুর বলছেন ভিন্ন কথা—

''গৃহেতে থাকিয়া যার হয় ভাবোদয়।
সেই ধর্ম গৃহকর্ম সাধু জানিবে নিশ্চয়।।
গৃহধর্ম গৃহকর্ম করিবে সকল।
হাতে কাম মুখে কাম ভক্তিই প্রবল।।''

অর্থাৎ গার্হস্থ্য জীবনই উপযুক্ত সাধন ক্ষেত্র। গৃহত্যাগ নয় গৃহকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হবে। মতুয়া সাধনে গৃহী যেমন যোগী হবে, যোগীও তেমনি গৃহী হবে। গার্হস্থ্য জীবন পরিপূর্নতার জীবন একে বাদ দিলে জীবন হয়ে যায় খন্ডিত। জগৎ ও জীবনের পরম সত্যকে জানার জন্য তথাগত বুদ্ধ, মহাবীর, গৌরাঙ্গ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অভেদানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, প্রনবানন্দ প্রমুখ ধর্মসাধকগণ সংসার ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর হরিচাঁদ কোন ক্ষেত্রেই, কোন পরিস্থিতিতেই সংসার ত্যাগের নির্দেশ দেননি। তিনি নিজেও পরিপূর্ণ সংসার করেছেন। তাঁকে যতই পূর্ণব্রহ্ম বলা হোক না কেন তিনি আদতে একজন সার্থক গৃহী মানুষ, গৃহে বসবাস করেই ধার্মিক জীবনযাপন করেছেন, মানুষের কল্যানের কথা ভেবেছেন। গৃহকে সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য তিনি দ্বাদশ আজ্ঞা দিয়ে গেছেন। সৎকর্ম এবং শ্রমের মর্যাদা দিয়েছেন তিনি। গৃহে থেকে সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই ধর্ম। সংসারের সকল কর্ত্তব্যের মাঝে যদি যথার্থ সাধুত্ব অর্জন করা যায় তবেই আদর্শ মতুয়া হওয়া যায়। কর্মের মাঝেই ঈশ্বরের নাম স্মরণ করতে হবে। চিন্তন এবং কর্ম সমানভাবে চলবে। কর্মবিহীন ভক্তি আদৌ গ্রহনীয় নয়।

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

'অয়মেব বিধির প্রোক্তঃ শূদ্রানা মন্ত্র বর্জিতঃ'

অর্থাৎ শূদ্রদের বেদমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার নেই। ব্রাহ্মণ শূদ্রের পরিচয় বিশ্লেষণ করতে মহাভারতে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির মন্তব্য করেছেন বৈদিক নিয়ম, বিধি, আচরণ যারা পালন করেন তারাই ব্রাহ্মন আর যারা তা করেননা তারা শূদ্র। বেদই হিন্দুদের আকরগ্রন্থ। তাকে নির্বিবাদে অনুসরণ করাই হিন্দুদের কর্ত্তব্য।
ঠাকুর বললেন— বেদের ভয় দেখিয়ে মতুয়াদের জব্দ করা যাবেনা। মতুয়ারা বেদকে মানেই না, অতএব এই শাস্ত্রের কঠোর অনুশাসন বা নির্দেশিকায় তারা ভয় যায় না। বেদপাঠ করতে যারা অনিচ্ছুক তাদের অধিকার-অনধিকারের প্রশ্নই ওঠে না।

''কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ পেলে খাই।
বেদাবিধি শৌচাচার নাহি মানি তাই।।''

অর্থাৎ মতুয়ারা বেদকে প্রামান্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করে না। অতএব বেদের কোন অধিকার নেই এদের উপর খবরদারি করার।

মনুবাদীরা বলছে— সেই যথার্থ ধার্মিক যে ধর্মের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। এমনকি একখানি অনুশাসন শাস্ত্র মনুসংহিতা। এই গ্রন্থে উল্লেখ আছে, জাতি, বর্ন, সম্প্রদায় ভেদে কার স্থান কোথায়. কার কী দায়িত্ব, কার অধিকারের সীমারেখা কোন পর্যন্ত, নারী-পুরুষ কার কেমন আচার বিচার হবে। এই শাস্ত্র প্রভু, ভৃত্য, স্বামী, স্ত্রী, ব্রাহ্মণ, শূদ্রের কর্মের পুরস্কার, তিরস্কার ও শাস্তির নির্দেশিকাও আছে। শাস্ত্র গ্রন্থে পূজা, পার্বন, যাগ, যজ্ঞ, তন্ত্র, মন্ত্রের যে নির্দেশ আছে তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলাই বিধি সম্মত।

ঠাকুর হরিচাঁদ হিন্দুধর্মের সংস্কারাচ্ছন্ন অযৌক্তিক লোকাচার ও শাস্ত্র অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলেছেন। তিনি চেয়েছিলেন শ্রেনীহীন, শোষনহূন এক নতুন মানব সমাজ গঠন করতে। তিনি বলেছেন—

''জীবে দয়া নামে রুচি মানুষেতে নিষ্ঠা।
ইহা ছাড়া আর যত সব ক্রিয়া ভ্রষ্টা।।''

মতুয়াদের ক্ষেত্রে মানুষকে ভালবাসা, কর্মনিষ্ঠা ও সৎ জীবনযাপন ভিন্ন অন্যকোন অনুশাসন বা শাস্ত্রীয় বিধি পালনীয় নয়। ধর্মীয় ও সামাজিক বিপ্লবকে পরিনতির দিকে পৌঁছে দিয়েই টাকুর হরিচাঁদ মাত্র ছেষট্টি বৎসর বয়সে ইহজগৎ থেকে বিদায় নেন। তখনও তাঁর অনেক ভাবনা, চিন্তা, পরিকল্পনা ফলবতী হতে বাকি কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তাঁকে বিদায় নিতে হল। বিদায় বেলায় শোকাকুলা বক্তবৃন্দকে তিনি সান্ত্বনা দিয়েছেলেন এই বলে— তিনি তাঁর পুত্র, গুরুচাঁদের ভিতরই অবস্থান করবেন অর্থাৎ তাঁর অসমাপ্ত কর্ম-ভাবা গুরুচাঁদই বাস্তবায়িত করবেন।

পিতৃ দায়িত্ব পালন করতে গিয়েই প্রথমে টাকুর গুরুচাঁদের স্মরণ হয়েছে

''মোর পিতা হরিচাঁদ গেছে বলে মোরে
বিদ্যা শিক্ষা স্বজাতিকে দিতে ঘরে ঘরে।।''

তাই তিনি সমগ্র দেশবাসীকে গ্রামে গ্রামে পাঠশালা নির্মান করার নির্দেশ দিলেন—

''সবাকারে বলি আমি যদি মানো মোরে।
অবিদ্বানপুত্র যেন নাহি থাকে ঘরে।।
খাও বা না খাও তাতে
ছেলে পিলে শিক্ষা দেও, এই আমি চাই।।''

বিভিন্ন স্থানে সভা সমাবেশ করে ঠাকুর তাঁর অনুরাগী ভক্তবৃন্দকে বিদ্যালাভের মাহাত্ম্য বুঝাতে লাগলেন। জাতির উন্নতির জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বিদ্যার্জন। বিদ্যা ছাড়া কথাই নাই, বিদ্যা কর সার।

''বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, অন্য সব ছার।''

তাঁর উপদেশ মান্য করে ভক্তবৃন্দ গ্রামে গ্রামে পাঠশালা নির্মাণে মনোনিবেশ করলেন, বিদ্যালয় গৃহ নির্মানে অক্ষম হলে বৈঠক খানা, প্রাঙ্গন বা গোশালাতেও বিদ্যার্থীরা সমবেত হয়ে মনোযোগের সঙ্গে বিদ্যার্জন করত। দূর গ্রাম থেকে গুরুমশাই আসতেন। বিভিন্ন বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন, অতি সামান্য পারিশ্রমিকে সন্তুষ্ট হয়ে পাঠ দান করতেন। প্রাথমিকের পর উচ্চবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, তারপর মহাবিদ্যালয় থেকে বিদেশ গমনে উদ্বুদ্ধ হলেন মেধাবী ছাত্রগন।

ঠাকুর তাঁদের আহবান জানিয়ে বললেন— এবার দেশের শাসন কার্য্যের সঙ্গে তোমাদের সম্পৃক্ত হতে হবে, তার জন্য রাজকার্য্য বা চাকরী গ্রহণ করতে হবে।

''দেশের শাসন যন্ত্র যে যে ভাবে চলে।
কিছু নাহি বোঝা যায় চাকুরি না পেলে।।''

কিন্তু সরকারি চাকরী প্রাপ্তি বড়ই কঠিন। সমাজের নিম্নবর্গের মানুষদের চাকরী হত না। ঠাকুর গুরুচাঁদ সি.এস.মিড সাহেবের সহায়তায় নিম্নবর্গের শিক্ষিত যুবকদের সরকারী চাকরীপ্রাপ্তির জন্য সংরক্ষনের সুযোগ অর্জন করলেন। এই সমাজের উচ্চশিক্ষিত যুবকবৃন্দ যোগ্যতানুসারে বিভিন্ন সরকারী সম্মানীয় পদে অধিষ্ঠিত হলেন।

তদ্‌কালে সাধারণ পরিবারের আর্থিক অবস্থা এমনই ছিল সকলের পক্ষে উচ্চ শিক্ষালাব সম্ভব ছিল না তা ছাড়া সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রও ছিল সীমিত। তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় কী হবে। ঠাকুর তাঁদের ব্যবসা-বানিজ্যে মনোযোগী হতে বললেন—

''আর শুন বলি কথা লক্ষী লভিবারে।
বানিজ্যে বসতে লক্ষী মানিও অন্তরে।।''

কিন্তু ব্যবসায় সততা থাকা বাঞ্চনীয়। অর্থলাভের জন্য যেন মানুষকে ঠকানো না হয়, শ্রম ও নিষ্ঠাকে অবলম্বন করে সৎভাবে ব্যবসা করা যায়, সততাই ব্যবসার মূলধন হওয়া উচিৎ। ঠাকুর বললেন—

''বানিজ্য সাধুর কর্ম মহাজনে কয়।
মহাজন হলে তার মহামন হয়।।''

সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ব্যবসা করা বড়ই কঠিন কেননা প্রাথমিক ভাবে কিছু অর্থের প্রয়োজন হয়। তার জন্য ঠাকুর নিজে অর্থ ধার দিলেন, যোগ্যতা ও বৃদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন জনকে বিভিন্ন ব্যবসায়ে নিয়োগ করলেন। চাকরী না হলেও ছোট বড় ব্যবসার মাধ্যমে ধন উপার্জনে সক্ষম হলেন স্বল্পশিক্ষিত যুব শ্রেণী। তাঁদের সদিচ্ছা, প্রচেষ্টা ও স্বাবলম্বন দেখে ঠাকুর গুরুচাঁদ আনন্দে আপ্লুত হয়ে বললেন—

''বিদ্যা চাই, ধন চাই বসন, ভূষণ চাই
হতে চাই জজ মেজিস্ট্রেট।
সাগর ডিঙ্গাতে চাই দেখি সেথা কিবা পাই
কেন রব মাথা করে হেট।।''

সমাজের একশ্রেণীর মানুষ, যাদের বিদ্যালাভ ও ব্যবসা করার সামর্থ্য ও যোগ্যতা নেই, তাঁরাও তো সমাজে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে চান। তাঁদের জীবন জীবিকার জন্য ঠাকুর কী উপদেশ দেন, সেই কথা জানার জন্য তাঁরা ঠাকুর সন্নিধানে এলেন। ঠাকুর তোদের মনোব্যথা উপলব্ধি করতে পেরে—পরম স্নেহের সুরে বললেন— তোরাই তো অন্নদাতা। তোদের শ্রমেই সমাজের সকল শ্রেনীর মানুষ অন্নগ্রহণের সুযোগ পায়। কৃষিকর্ম না থাকলে সমাজ বাঁচে না।

''সর্ব কার্য্য হতে শ্রেষ্ঠ কৃষিকার্য্য হয়।
এ কার্য্য না করা আমাদের ভাল নয়।।''

জমি, মাটি মাতৃসম। মাটি না থাকলে ফসল উৎপন্ন হ'ত না, মাটি না থাকলে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব থাকত না। তাই তাকে বলা হয় ধরিত্রী। নিজের মায়ের মত তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করা উচিৎ।

''মন দিয়ে কৃষি কর, পূজ মাটি মায়।
মনে রেখ বেঁচে আছ মাটির কৃপায়।।''

মতুয়া সমাজের অনুগামী যাঁরা, তাঁরা স্বভাবতই কৃষিনির্ভর। কৃষিকর্মই তাঁদের প্রাথমিক জীবিকা। তাঁদের পক্ষে এই কাজ সহজ ও স্বাভাবিক। ঠাকুরের উপদেশে তাঁদের জীবন-জীবিকার প্রতি কোন হীনমন্যতা রইল না উপরন্তু কৃষিকার্যের প্রতি অধিক আগ্রহশীল হলেন।

সাধারণ গৃহস্থ মানুষ যাঁরা অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে বেঁচে থাকেন, সামান্য অর্থসঞ্চয় করেন। ঠাকুর তাঁদের সর্বক্ষণ মিতব্যয়ী হবার উপদেশ দিয়েছেন। ধনবান বাবু সমাজকে অন্ধ অনুকরন করতে মানা করেছেন। বারো মাসে তেরো পার্বন বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানে তাঁরা যেন অর্তের

অপচয় না করেন, সদুপায় অর্জিত সদ্ব্যয় হওয়া আবশ্যক। তাই ঠাকুর বলেছেন—

''বিবাহ শ্রাদ্ধেতে সবে কর ব্যয় হ্রাস।
শক্তির চালনা, সবে রাখ বারমাস।।''

ঠাকুরের চিন্তা ও ভাবাধর্ম অনুসরন করে সুদীর্ঘ কালের একটি অনগ্রসর জাতি বিদ্যা, চাকরী, ব্যবসা, কৃষিকার্য্যের মাধ্যমে ধনে মানে প্রতিপত্তি অর্জনে অগ্রসর হলেন। তাঁরা ভাবলেন সার্বিক উন্নতি হয়ে গেল। পরম প্রেমময় রাজর্ষি গুরুচাঁদ তাঁদের কাছে ডেকে বললেন— ধন সম্পদ অপেক্ষা আত্মমর্যাদা অনেক বড় বস্তু। দাসত্বের মত গ্লানি মানব জীবনে আর কিছু নেই। রাজক্ষমতা, শাসন ক্ষমতা দখল করতে না পারলে তোমাদের দাসত্ব থেকে মুক্তি নেই ।

''ধর্মের পালক রাজা জানিবে নিশ্চয়।
রাজশক্তি বিনা কিছু বড় নাহি হয়।।''

যদি ধর্মকেও রক্ষা করতে হয় সে ক্ষেত্রেও রাজশক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হতে পারে। সম্রাট অশোক যেমন বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করেছিলেন, পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। দেশের রাজা যে ধর্ম পালন করেন, প্রজাবৃন্দও স্বভাবতঃ সেই ধর্ম অনুসরন করেন। ধর্মপ্রচারে রাজার যে ক্ষমতা সে ক্ষমতা আর কারও থাকতে পারে না এবং রাজা যদি ধার্মিক হন প্রজাবৃন্দও ধর্মপথে বিচরণ করেন।

''যে ধর্মে রাজা আছে সেই ধর্ম তাজা।
ধর্ম রাজ্যে বাস করে ধর্মশীল প্রজা।।''

জাতির উন্নতির জন্য ধর্মের রুপান্তর ঘটানোর প্রয়োজন হতে পারে, যুগে যুগে সব ধর্মেরই সংস্কার হয়েছে। ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাকে সুসংগঠিত করতে হলে তখন রাজশক্তিকে হাতিয়ার করতে হয়—

''জাতি, ধর্ম, যাহা কিছু উঠাইতে চাও
রাজশক্তি তাকে যদি যাহা চাও পাও।।''

সমাজের অতি সাধারন মানুষ, ঠাকুরের রাজনৈতিক তত্ত্বকথা উপলব্ধি করতে পারলেন না। ঠাকুর স্পষ্টভাষায় তাঁর বক্তব্য পরিষ্কার করে দিলেন— ক্ষমতা মন্দির দখল কর পরবর্তীকালে যার প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল বাবাসাহেব আম্বেদকরের মুখে। ঠাকুর বললেন—

''আইন সখায় যাও আমি বলি রাজা হও
দূর কর এ জাতির ব্যথা।।''

গুরুচাঁদ পৌত্র প্রমথ রঞ্জন, ঠাকুরদাদার আদেশ শিরোধার্য্য করে সাগর ডিঙ্গিয়ে বিলাতে গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করে ফিরে এসে আইন সভায় প্রবেশ করেছিলেন।

ঠাকুর গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন— বিদ্যাহীন, শিক্ষাহীন সাধারণ মতুয়া ভক্তবৃন্দ নামে প্রেমে মাতোয়ারা হয়েই আনন্দ পায়, ঠাকুরের প্রতি আত্মনিবেদন করে সঙ্গীতে কীর্তনে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে তুপ্তি পায়, যথার্থ মতুয়া ভাবাধর্ম তারা জানতে চায়না। ডঙ্কা, কাশি, সিঙ্গার জয়ধ্বনিতে তারা বিভোর হয়ে যায়, তাঁদের ভক্তি ও বিশ্বাসের বহিপ্রকাশ ঘটে গড়াগড়ি, মাতামাতি ও উচ্চনিনাদে। ঠাকুর তাদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—

''কান্দাকাদি ঢলাঢলি কতকাল করে গেলি
কী ফল বা পেলি তাতে বল।
কর্ম ছেড়ে কান্দে যেই তার ভাগ্যে মুক্তি নেই
হবি নাকি বৈরাগীর দল।।''

অর্থাৎ কর্মবিহীন ভক্তির প্রয়োজন নেই। জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির সমন্বয় চাই। কর্মই গার্হস্থ্য জীবনের মেরুদন্ড। কর্মশূণ্য বৈরাগ্য মতুয়া ধর্মের লক্ষ্য নয়। একজন আদর্শ মতুয়ার কর্তব্যই হল হাতে কাম, মুখে নাম ও মানুষকে ভালবাসা।

মতুয়া দর্শন, সমাজ, রূপান্তরের ধর্ম, সমাজ পরিবর্তনের ধর্ম। তার জন্য মানুষটিকে সচেতন করতে হবে জাগরণের বাণী শুনিয়ে আন্দোলন মুখী করে তুলতে হবে। এই সব কথা কীর্ত্তনের আসরে চলে না, বিভিন্ন অঞ্চলে সভা, সমাবেশ করে মানুষকে সংঘবদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। আন্দোলন ব্যতীত সমাজ সংস্কার বা পুর্নজাগরণ ঘটে না।

''ঘরে ঘরে আন্দোলন প্রয়োজন হল।
সভা কর, সভা কর প্রভুজী হাঁকিল।।''

ঠাকুর গুরুচাঁদ ঋষিতুল্য ব্যক্তি হয়েও রাজনীতিকে গ্রহন করে ছিলেন অন্তর থেকে, সুদীর্ঘ কালের অবহেলিত, বঞ্চিত, উৎপীড়িত, নিরক্ষর, দরিদ্র জাতীকে রাজা হবার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তাই তিনি রাজর্ষি গুরুচাঁদ।

ঠাকুর গুরুচাঁদ বলেছেন— জাতিকে জননীর মত শ্রদ্ধা করতে হবে। জাতির উন্নয়নই সর্বক্ষনের ধ্যানজ্ঞান হওয়া উচিৎ। যে কোনো উন্নয়নকে বাস্তবায়িত করতে হলে আগে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন। শ্রম, বুদ্ধি, অর্থ, সময় যার যতটুকু সাধ্য ত্যাগ করতে হবে।স্বার্থত্যাগ করতে না পারলে অপরের কল্যান করা যায় না।

''জাতির উন্নতি লাগি হও সবে স্বার্থত্যাগী
বিদারাত্রি চিন্তা কর তাই
জাতিধর্ম জাতি মান জাতি মোর ভগবান
জাতি ছাড়া অন্য চিন্তা নাই।।''

মতুয়া ভাবাদর্শকে মাধ্যম করে ঠাকুর হরিচাঁদ গুরুচাঁদ সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছিলেন, সমাজের

দলিত পতিত মানুষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষন থেকে মুক্ত করার জন্য স্বতন্ত্র মতুয়া ধর্মপ্রচার করেন। এই ধর্ম মানব কল্যানে তথা বিশ্ব কল্যানের ধর্ম।

অগ্নিকন্যা কল্পনা

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়

অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রামের শ্রীপুরে ব্রিটিশ ভারতের রাজকর্মচারী বিনোদবিহারী দত্তগুপ্তের নিবাস। বাড়ির পরিবেশ মোটেই স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল নয়। এই ঘরেই মা শোভনবালার কোল আলো করে এলেন কল্পনা, মায়ের আদরের ভুলু, ১৯১৩ সালের ২৭ জুলাই। কিন্তু চট্টগ্রামের বাতাসে ছিল স্বাধীনতার কানাকানি, ঘরে ঘরে দেশপ্রেমী-বিপ্লবী, পাহাড়ে-পাহাড়তলিতে। এমনই বাতাবরণে কল্পনা বড় হয়ে উঠলেন। অভিজাত পারিবারিক পরিবেশ পেয়েছিলেন কল্পনা, লেখাপড়ার অঢেল সুযোগ। অত্যন্ত মেধাবী কল্পনার ছিল বই পড়ার নেশা। কানাইলাল, ক্ষুদিরামের জীবনী, পথের দাবী ইত্যাদি স্বদেমী বই পড়ে ফেলেন অতি অল্পবয়সে। চট্টগ্রামের দেশপ্রেমের পরিমন্ডলে এইসব বই তাঁর হৃদয়ের গভীরে স্বদেশপ্রেমের বীজ প্রোথিত করেছিল।

চট্টগ্রামের শ্রীপুর স্কুলেই অঙ্ক ও সংস্কৃতে লেটার সহ ম্যাট্রিকুলেশানে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। এবার থামলে চলবে না। উচ্চশিক্ষার জন্যে কলকাতার বেথুন কলেজে। এখানে ছিল গুপ্ত রাজনৈতিক বাতাবরণ। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি হয় এই পরিমন্ডলে। কল্যানী দাশের ছাত্রী সঙ্ঘে নাম লেখালেন কল্পনা। সেই শুরু হল তাঁর পথচলা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দেশমাতাকে ভালবেসেছেন, সেবায় থেকেছেন অকুন্ঠ।

পাশাপাশি চলেছে তাঁর পড়াশুনা। সারাজীবনই তিনি পড়াশুনা চালিয়ে গেছেন— তা সে গৃহবন্দী থাকুন আর জেলেই থাকুন।

১৯৩০ সালে ১৮ এপ্রিলে ঘটনা সেসময়ের বিখ্যাত সান্ধ্যপত্রিকা ‘নায়ক’-এর বিশেষ সংখ্যা। সংবাদপত্রটি নিয়ে সবাই হৈ চৈ শুরু করেছে— চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠন, টেলিফোন টেলিগ্রাফের অফিস ধ্বংস, রিজার্ভ পুলিশ লাইন অধিকার। প্রতিটি কাজ সুসম্পন্ন করেছে চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবী তরুনদল। তাদের ঘরের ছেলেরা। প্রীতি, কল্পনা দু'জনেই ভাবছে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাবছে আমাদের জন্মভূমি চট্টগ্রামে এতবড় ঘটনা ঘটে গেল আমরা এসময় কলকাতায়— কোনও সাহায্যই করতে পারলাম না।

প্রীতি আর কল্পনা দু'জনেরই মন চলে গেছে চট্টগ্রামের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাচে। পড়াশুনায় মন আর বসছে না— তাঁরা কী চট্টগ্রামে গিয়ে বিপ্লবী তরুনদলের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে সামিল হবার জন্য মনে মনে তৈরী হতে থাকলেন।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত দু'জনের দেখা বেথুন কলেজে। কল্যানী দাশের ছাত্রী সঙ্ঘে। দু'জনেই চট্টগ্রামের মেয়ে— একজন শ্রীপুর আর একজন ধলঘাটের। বছর দু'-এক আগে পরে এসেছিল সমমনস্ক দুটি মেয়ে— চট্টগ্রামের দুই অগ্নিকন্যা। মাষ্টারদার বিপ্লবী ছায়ায় যাদের কর্মকান্ড— যাদের গড়ে ওঠা।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে মেয়েদের আসা মাষ্টারদা পছদ করেননি। মেয়েরা অন্তঃপুরে থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাহায্য করবে আর তৈরী করবে নতুন নতুন মানুষ, সত্যিকারের দেশপ্রেমী, অদম্য স্বাধীনতা প্রেমী— এমনটাই ইচ্ছা তাঁর। তবু এই দুই কন্যার আগ্রহে তাদের পারদর্শিতার কাছে মাষ্টারদা তাঁর সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হন। এদের নিতেই হল বিপ্লবী কাজকর্মে প্রত্যক্ষভাবে। শর্ত ছিল নিজেদের শারীরিক মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে এই গুরুভার বহন করবার জন্যে। কঠোর অনুশীলনের মধ্যে প্রীতি, কল্পনা দু'জনেই ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, নানান অস্ত্র-চালনার কৌশল আয়ত্ত করেন। পুরুষের পোশাকে সচ্ছন্দ হতে হবে। রাত-বিরেতে একা চলাফেরা তো করতেই হবে।দেশের কাজে এদের কাছে এসব সামান্যই বোধ হয়েছিল।

কল্পনা ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাস অবধি বেথুন কলেজের ছাত্রী। কল্পনা দত্ত ছুটিতে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে। আর ফেরা হয়নি। চট্টগ্রাম কলেজেই অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি. -তে ভর্তি হলেন। এই সময় বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক গবীর হয়। বারবার তিনি চট্টগ্রামেই ফিরে যেতে চাইতেন। পরিনত বয়সেও দেখি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি ফিরে গেছেন সেই পর্বতসঙ্কুল তাঁর মাতৃভূমিতে-জন্মভূমিতে।

১৯৩১ সালে যখন কল্পনার মাত্র আঠারো বছর বয়স তিনি ডিনামাইট ফাটিয়ে অনন্ত সির্হ ও গনেশ ঘোষকে জেল থেকে মুক্ত করার দায়িত্ব পান যদিও তার আগেই ধরা পড়ে তাঁকে গৃহবন্দী হতে হয়।

কল্পনার গুপ্ত নাম ছিল রমা। বিপ্লবীদের খবর আদান-প্রদানের জন্য গ্রামের ভিতর যাত্রা করতেন। পুলিমের কাতায় তাঁর নাম উঠে যায়। রাতের অন্ধকারে পুরুষের ছদ্মবেশে কাট্টালির গোপন আস্তানায় মাষ্টারদা ও নির্মল সেনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য যাবার পথে গ্রেপ্তার হন। ১০৯ ধারায় ভবঘুরে বলে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। প্রমান অভাবে ছাড়া পান। ছাড়া পাওয়ার পর গোপন আস্তানায় থাকার নির্দেশ দেন মাষ্টারদা। গোপন অবস্থাতেও কল্পনা পালন করে গেছে সব নির্দেশ।

প্রীতি আর কল্পনাঅ রানী আর ভুলু। দু'জনেরই যৌথভাবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমনের কথা হয়। কিন্তু তার সপ্তাহখানেক আগেই এই পলাতক বীবন শুরু হয় তাঁর।

প্রীতিলতার পরেই কল্পনা চট্টলার জনমানসে ও পুলিশের কর্মচাঞ্চল্যে মূর্তীমুতি চিন্তার কারণ হয়ে জেগে রইল। কল্পনার রাজকর্মচারী পিতার কাছে কোনও সহানুভূতি পাননি তাঁর এই দেশপ্রেমী জীবনে— তিনি ঢালাও হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন ওই মেয়েকে যেখানে পাবে কেটে ফেলবে। কিন্তু ছদ্মবেশী কল্পনার নাগাল পাওয়া সোজা ছিল না। তরুন কিশোর বালকের জামা কাপড়ে হল্পনার কল্পিত মূর্তির বাইরে অন্য উপস্থিতি। মাষ্টারদা তার দায়িত্ব তারকেশ্বর দস্তিদারের উপর অর্পন করেন। পরবর্তীকালে তারকেশ্বরের প্রধানতম কর্মসঙ্গিনী হয়েছিলেন কল্পনা দত্ত। পরম নির্ভরতায় এই পরমপ্রিয় ফুটুদার (তারকেশ্বর) সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো চলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও তিনি তাঁরই নিদের্শের অপেক্ষা করেছেন।

কল্পনাকে কেন্দ্র করে এক নারী বাহিনীর অভিযান পরিক্লনা করেছিলেন মাষ্টারদা প্রীতির স্থানটি পূর্ণ করতে। কিন্তু সেই বাহিনী গঠন করতে শক্ত মানুষ নির্মলের মতো ব্যক্তির অভাব বোধ করেছিলেন তিনি। এরকম পরিস্থিতিতে কল্পনার হঠাৎ অতর্ধানের পর অন্যান্য সন্দেহভাজন মেয়েদের গতিবিধির উপর পুলিশের নজর বেড়ে যায়। পুরুষ বেশে মালকোচা মারা ধুতি, হাফসার্ট কল্পনার ঋজু দেহে সুন্দর মানাত, পূর্ব পরিচিতরাও সে ছদ্মবেশে বিভ্রান্ত হতো।

কুন্দপ্রভা, নির্মলা চক্রবর্তী, সুহাসিনী রক্ষিত, নিরুপমা বড়ুয়া, বকুল দত্তেদের আগ্রহে একদিন রাত্রে ছনরা গ্রামে দত্তদের দশভূজা বাড়িতে এক বৈঠক হয়। এই বৈঠক নেতা সূর্য সেন উপস্থিত হয়ে মেয়েদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই নারীবাহিনীর প্রধান ছিলেন কল্পনা দত্ত।

কিছুকাল ধরে মাষ্টারদা গৈরলা গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে ছিলেন— কল্পনা শাষ্টারদার সাথে গোপনে যোগাযোগ রক্ষা করে ভাবী কর্মকান্ডের সঙ্গে গবীরভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন। এই গ্রাম গরীব গৃহস্থ বিশ্বাসদের বাড়ির আশ্রয়ে ছিলেন। এঁদের অন্নের ভার নিয়েছিলেন বিপ্লবী নিষ্ঠাবান দেশকর্মীব্রজেন সেনের বউদি নেত্র সেনের স্ত্রী। মাষ্টারদার মাথার দাম তখন দশহাজার টাকা।

১৯৩৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারী অর্থলোভী নেত্র সেনের প্ররোচনায় মাষ্টারদা গ্রেপ্তার হন। কল্পনা দুর্যোগ পেরিয়ে পালাতে সক্ষম হয়।

চট্টলার নির্জন কারাকক্ষে মাষ্টারদার দুঃসহ দুঃখের মধ্যেও তাঁর পরিকল্পিত অসমাপ্ত কর্মকান্ড টেনে নিয়ে চলেছেন কল্পনা, সঙ্গী মহেন্দ্র, বিনোদ। নেতা তারকেশ্বর। মাষ্টারদার সাথে জেলের ভেতরেও যোগাযোগ সূত্র তৈরী— সূর্য সেনকে জেলের বাইরে আনার জন্য গভীর ষড়যন্ত্র শুরু হল— খুব সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে জেলের ভেতর সুখেন্দু দত্ত ও অসূল্য বিশ্বাসের সহায়তায়, সবচেয়ে তৎপর কর্মী তারকেশ্বর ও সহকারী কল্পনা। ২০/৩/৩৩ তারিখে এই ষড়যন্ত্রের মোড় ঘুরে গেল, ষড়যন্ত্রের গতি সাফল্যের কাছে এসেও বিফল হল।

প্রায় দু'মাস পর ১৮/৫/৩৩ তারকেশ্বর কল্পনা হহিরার গুপ্ত কেন্দ্রে নতুন কর্মোদ্যোগের কথা ভাবছেন এমন সময় ২৪/২৫ জন পুলিশ মিলিটারি ঘিরে ফেলে পূণু তালুকদারের বাড়ি। তারকেশ্বর ও কল্পনা এই বিশাল বাহিনীর সাথে লড়াই সম্ভব নয় বোধ করে অনন্যোপায় হয়ে আত্মসমর্পন করেন। প্রথমে কল্পনা পরে তারকেশ্বর।

মাষ্টারদা তারকেশ্বর ও কল্পনা দত্তের বিচার প্রহসন সতর্ক প্রহরায় সমাধা হয়। মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসির হুকুম হয়। কল্পনা দত্তের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দার্য হয়।

ব্রিটিশ সরকার শেষ পর্যন্ত দ্বীপান্তরে পাঠাতে পারেনি কল্পনাকে। কারাদন্ডই হয়েছিল কল্পার। যাঁরা উদ্দাম দামাল তাঁদের শক্ত করে বেঁধে রাখতে হয়— তাই অন্য মহিলা বন্দীদের মুক্তি দিলেও ব্রিটিশ সরকার তখনও তাঁকে আটকে রাখে। ছয় বছর ধরে তিনি বন্দী জীবনযাপন করেন।

ছয় বছর পর গান্ধীজির মধ্যস্থতায়ও ব্রিটিশ সরকারের অনুকম্পায় কল্পনা কারামুক্ত হয়ে চলে যান চট্টগ্রামে ১৯৩৮ সালে।

জেলে থাকতে তিনি গভীর পড়াশুনায় মগ্ন হন। ধীরে ধীরে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন। জেল থেকে মুক্ত হয়ে দেখলেন তাঁর আন্দোলনের সঙ্গীরা অনেকেই যোগ দিয়েছে কমিউনিস্ট পার্টিতে। পুরোনো সহকর্মীদের অনুপ্রেরনায় শেষ পর্যন্ত তিনি কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

দেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে কল্পনা ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। উদ্ধারের কাজে। কল্পনা দত্ত দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে উদ্ধার করতে যেমন ছিলেন অনলস তেমনই মায়ের সন্তানদের পরিত্রানের কাজেও ছিল না তাঁর কোনও ভয় বীতি কুণ্ঠা। দুর্বিক্ষের পর চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হয়ে যান বোম্বাই-এ। সেখানে পরিচিত হয় পি.সি. যোশির সাথে। ক্রমশ আকৃষ্ট হলেন পূরণ চাঁদ যোশির প্রতি। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন ১৯৪৩ সালে। তারপরেও চট্টগ্রামে থেকে কাজ করেছেন। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর তিনি চট্টগ্রামে থেকে যান। ১৯৫০ সালে চাকরি পান [illegible] এ। পরবর্তী সময়ে দিল্লিতেই থাকতেন। সেখানে নারী আন্দোলনে অগ্রনী ভুমিকা নেন। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তাতে মৈত্রী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় তাঁর উল্লেখযোগ্য বূমিকা ছিল। তিনি [illegible]-এর সাধারণ সম্পাদিকা ছিলেন। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থান নিয়ে নানা বই লিখেছেন। তাঁর স্বামী ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। সংগ্রাম ছিল তাঁর ধমনীতে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মানুষের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সেই সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। কল্পনার অতুলনীয় কর্মকুশলতা অনন্তকাল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

জন্মের শতবর্ষে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা!

রিক্সাওয়ালা

কবি সুশান্ত সরদার

এই পরিবেশ কে দূষিত করেনি যারা,
কেবল ঘাম ঝরিয়েছে প্যাডেলে চাপ দিয়ে।
ভ্যাপু বাজিয়ে লঙ্ঘন করেনি শব্দের মার্তা,
সোয়ারীর সন্ধান ব্যস্ততায় কেটে যায় সারাদিন।
পাশ কাটিয়ে চলে গেছে গলি থেকে রাজপথে,
সেই কঠোর পরিশ্রমি রিক্সাওলারা।
শরীরের ক্লান্তি মেটাতে রিক্সায় বসে কখনো,
বার বার গুনতে থাকে কয়েকটা রোজগারের টাকা।
ঘামে ভেজা শরীরে গামছায় মুখমুছে
একে অন্যের কাছে জানতে চায় কত হয়েছে।
যার একটু কম দেহের ক্লান্তি ঝেড়ে,
প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে দাঁতে দাঁত দিয়ে
তারা প্রতিবাদ হানতে জানেনা,
দোষ দেয় কেবল নিজের ভাগ্যকে।
কড়্ কড়্ মড়্ মড়্ শব্দে রিক্সার গতি,
থমকে যায় রাস্তার ভিড়ের মাঝে।
তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম বহুদিন
এই ব্যস্তময় সভ্যতার বুকে শিখেছি ওরা
ধৈর্য্য আর অপেক্ষার মূলমন্ত্র
যা তাদের থেকে আমার পরম পাওয়া
সমস্ত দুঃখকে জয় করে হাসি মুখে
রোদ ঝড় বৃষ্টিকে ভয় পায় না তারা
কেবল কয়েকটা টাকার বিনিময়ে বিকিয়ে দেয়
দেহের সমস্ত ক্লান্তি আর দুঃখকে
ওদের কথা পৌঁছে দিতে হবে তাদের কাছে
যারা এই সমাজটাকে আজও সুস্থ রাখতে চায়।।

‘‘জারী থাকলো যুদ্ধ’’

সুশান্ত সরদার

ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
দুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি বাঁচার সন্ধানে

দাউ দাউ করে জ্বলছে আমার কুঁড়ে ঘর
পুড়ছে আমার আত্মীয় পরিজন আমার মন
আগুন বাইরে ও ভিতরে

হাজার হাজার বছরের মানুষের শ্রমে অর্জিত
মানব সভ্যতাকে বারে বারে ম্লান করেছে
হিংস্র পশু নরখাদকের দল
এরা থাকে সমাজে মানুষেরমধ্যে মুখোশ পরে
মানুষ সেজে, চেনার উপায় নেই, চিনতে পারি না

সেদিনও ছিল এমন দিন চারদিকে আগুন মৃত্যু
রক্তের স্রোতে সন্তান আর স্বজন হারানোর বেদনা
বন্ধু সেজে সান্তনা দিতে বাড়িয়ে দিয়েছিল
বন্ধুত্বের হাত এরা, বলেছিল জীবনের কথা
জয়ের কথা, বাঁচার কথা

বুঝিনি সেদিন এরাই হানবে আঘাত জ্বালাবে আগুন
নেভাবে জীবন, শিশুঘাতী, নারীঘাতী পশুর দল
তাই আজও ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
হুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি মানুষ ও জীবনের
সন্ধানে।

ঘুট ঘুটে অন্ধকারের মধ্যে, অন্ধের মতো
দুটি হাত সম্মুখে প্রসারিত করে
খুব সাবধানে এগিয়ে চলেছি বাঁচার সন্ধানে।।

এক শহীদের সাক্ষাৎকার
‘‘জারী থাকলো যুদ্ধ’’

প্রেরনা রায় সেনগুপ্ত

প্র তোমাকে শহীদের মর্যাদা দিয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশন, জানো?

দামিনী শহীদ? কী করে হলাম? কার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে শহীদ হলাম আমি? আমি তো বলি হলাম পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতে, শহীদ নই আমি। আর যারা প্রকৃত শহীদ, মনিপুরের মনোরমা, সিঙ্গুরের তাপসী মালিক, মধ্য ও উত্তর পূর্ব ভারতের অসংখ্য নাম না জানা লড়াকু মহিলাদের শহীদ তো দূরে থাক তাদের মানুষ মানতেও দ্বিধা হয় মহিলা কমিশনের।

প্র ভারতীয় সেনাবাহিনী তোমার মৃত্যুতে তাদের নববর্ষের অনুষ্ঠান বাতিল করেছিল...

দামিনী আর এই সেনাবাহিনীই সারা উপমহাদেশের তথাকথিত উপদ্রুত অঞ্চলে গণধর্ষণের বিশ্বরেকর্ড কায়েম করেছে, হাসিও পায়।

প্র তোমায় নিয়ে সারা ভারত জ্বলে ওঠার পরও সারা দেশে থামেনি ধর্ষণের বন্যতা,

দামিনী কি করে থামবে বলে প্রত্যাশা করো, ধর্ষণ শুধুমাত্র শারীরিক লালসার পরিণতি নয়, এটা একটা দমনের হাতিয়ার। যা দিয়ে পিতৃতন্ত্র জারী রাখছে তার শাসন ও শোষন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জও মেনে নিয়েছে যে ধর্ষণ একটি যুদ্ধের অস্ত্র। তার মানে একটা যুদ্ধ চলছে। ধর্ষণ তার অস্ত্র মাত্র।

প্র কার সঙ্গে কার যুদ্ধ দামিনী? পুরুষ বনাম নারীর যুদ্ধ?

দামিনী না, যুদ্ধটা পিতৃতন্ত্র বনাম সমানাধিকার ভাবনার। পিতৃতন্ত্রের সচেতন-অসচেতন-অল্প বচেতন মহিলা প্রচারকও পাবে। আবার সমানাধিকারের সঙ্গে পুরুষ সৈনিকও আছে। তাই যুদ্ধটা কোনো ভাবেই পুরুষ বনাম নারীর নয়। কিন্তু এটা আজ মানতেই হবে যে যুদ্ধটা চলেছে, আর ধর্ষণ সেইযুদ্ধের এক বড় হাতিয়ার।

প্র ধর্ষণবিরোধী কড়া আইন কী ধর্ষণকে ধ্বংস করতে পারবে? তোমার কি মনে হয়?

দামিনী পারবে না, পারতে পারে না। কোনো আইন দিয়ে হবে না। আর তুমি বিষয়টাকে ধর্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছো কেন? প্রশ্নটা সমানাধিকারের। ধর্ষণের শাস্তি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন হলেও আসলে তো পিতৃতান্ত্রিকতারই জয়। কারণ ধর্ষণের সাথে সাথেই নারীর সম্মান চলে যায়, এমন ভাবনা তো পিতৃতন্ত্রই প্রচার করে।

প্র তাহলে রাস্তা কি দামিনী?

দামিনী রাস্তা তো একটাই, নারী স্বাধীনতা। যা সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করবে। সেই সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার পথে যদি মাতৃতন্ত্রের এক সাময়িক পর্বও আসে তাও স্বাগত। তবে সেটা অবশ্যই যেন উৎক্রমনশীল পর্ব হয়।

প্র কোনো আশার আলো দেখছ সুদুর ভবিষ্যতেও?

দামিনী উত্তাল দিল্লির রাজপথে আশা দেখতে পাওনা। যদিও সেই উদ্দামতাতেও ছিল দাবী দাওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা, আরও অনেক দুর্বলতাও ছিল, তাও। তোমার রাজ্যে সোনামুখী নামে আধা–সামরিক বাহিনীর হাতে মহিলারা গণধর্ষণের শিকার হওয়ার পরদিনই ঝাড়গ্রাম বাঁচানো শহরে হাজার মহিলার মিছিল আশা দেখায় না তোমায়? মনোরমা শহীদ হওয়ার পরদিন মনিপুরের মায়েদের দৃপ্ত প্রতিবাদ কি আমার আলো তুলে ধরে না?

প্র যে যুবসমাজ তোমার চলে যাওয়ায় এত কাঁদছে তাঁদের কি বলবে তুমি?

দামিনী অভিযোগ জানাবো। শুধু আমার জন্য কেন কাঁদলো ওরা? কেন এই বিস্ফোরণ প্রতিটা ধর্ষণের জন্য হয় না? কারণ কি আমি তুলনায় স্বচ্ছল এবং দিল্লির মেয়ে বলে? হাজারিবাগের জয়া, বীজাপুরের সোনি, বরানগরের রানীরা গরীব আর দলিত-আদিবাসী বলে কান্না আসে না? কেন ওঁরা ফেঠে পড়ছে না হিন্দু ধর্মস্থলগুলোর বিরুদ্ধে? যেখানে 'আদর্শ' যৌনসঙ্গম বলতে যা বর্ণিত আছে তা ধর্ষণ ছাড়া কিছু নয়, কেন তারা কথা বলছে না ঐ সাম্রাজ্যবাদী পণ্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যা নারীদেহকে আশ্রয় করে ও বিক্রি করেই বেঁচে আছে?

প্র ভার্মা কমিটির রিপোর্টও সরকার সহ সব কটি মূল ধারার রাজনৈতিক দল গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে জানো?

দামিনী সেটাই স্বাভাবিক নয় কি? কারণ ঐ রিপোর্টে বেশ কিছু ভাল দিক ছিল, কিন্তু সেগুলি প্রতিটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে যেত। প্রতিটি মূল ধারার রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধেই নারী নির্যাতনের একগাদা অভিযোগ আছে।

প্র মজার কথা হলো নকশালবাদী বলে প্রচারিত গোষ্ঠীগুলিঐ রিপোর্টকেই স্বাগত জানিয়েছে...

দামিনী তোমাকে এই তথ্যটির সাথে আরওএকটি তথ্য জানিয়ে রাখি, কেন্দ্রিয় সরকারের সমীক্ষা অনুযায়ীই ভারতের ১৭ টি ব্লকে নারী নির্যাতনের সংখ্যা শূণ্য। যদি পিতৃতান্ত্রিক এই রাষ্ট্রব্যবস্থার বন্দুক থেকে পুরুষের একনায়কত্ব বেরিয়ে আসে তবে বন্দুক থেকেই বেরিয়ে আসুক না নারীর একনায়কত্ব, যার অভিমুখ থাকবে সমানাধিকারের দিকে, ক্ষতি কি?

প্র ৮ ই মার্চ, আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস পেরিয়ে গেল, ৮ ই মার্চ উপলক্ষে কিছু বলতে চাও আমাদের?

দামিনী একটা ঘটনা বলতে চাই, তাকে ঠিক ঘটনা বলে চলে না। ঘটমান কিছু সেটা। এ দেশের বনাঞ্চলে, যেখানে আদিবাসী নারীরা বিয়ের পর দেহের উর্ধাঙ্গে কাপড় পরতেও পারত না, ঋতুমতি হলে থাকতে হতো গ্রামের বাইরে, ডিম-মাছ-মাংস খেতে পারত না, তারাই আজ গড়ে তুলছে সংগঠন। ৮ ই মার্চ সারা ভারতে বিশাল বিশাল সমাবেশ দিয়ে পালিত হয়েছে নারী দিবস। রাঁচী শহরের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন কম করেও ১৫ হাজার মহিলা। পিতৃতান্ত্রিক মৃত্যু যাত্রাপথ পেরিয়ে এসেছিল যেন ১৫ হাজার আগুন পাখি। তাঁরা আমায় যেন বলছে 'যুদ্ধ জারী থাকলো দামিনী, তোমার জন্য যুদ্ধ, আমাদের জন্য যুদ্ধ'। যদি পারো তো সেই যুদ্ধে সামিল হয়ো। ভালো থেকো, যুদ্ধে থেকো।

(নির্মম রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার ছত্তিশগড়ের আদিবাসী শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী সোনী সোরির মুক্তি চাই।)

‘জয় ভীম কমরেড’

অর্ক সেনগুপ্ত

যে কোনো সংগ্রামের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন সঠিক অবস্থান নেওয়ার ওপরই নির্ভর করে সংগ্রামের জয়-পরাজয়। সেই সময়টাতেই সংগ্রামের প্রতি আন্তরিক সাথীদের শিখতে হয় সংগ্রামের ইতিহাস থেকে। শিখতে হয় নির্মোহ ভাবে। ঠিক করতে হয় ভবিষ্যতের পথ। বহুজন আন্দোলনের আমরা একটা তেমনই সময়ের মধ্যে দিয়ে চলেছি। এই সময়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গ্মাদের জন্য। কারন দলিত-আদিবাসী-সংখ্যালঘু ও নারী আন্দোলনের ময়দানে আমরা অজস্রধারার আন্তরিক প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং এখনও করছি।পেরিয়ার- ফুলে-রোকেয়া-আম্বেদকারের দেখানো পথে অনেক সংগ্রামী সাথী আপোষহীন লড়াই করে গেছেন ও যাচ্ছেন। তারই সাথে এঁদেরকে শুধুমাত্র মূর্তিতে পরিনত করে ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁবেদারেও পরিনত হয়েছেন অনেকে। আর এই তাঁবেদার তৈরী করে শোষণ চালিয়ে যাওয়াটা ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা যে কোনো শোষণ মতাদর্শের বহুদিনের নীতি। আবার অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর জঙ্গি আঘাতও হেনে চলেছেন বহুজন জনগণ, তারা বামপন্থী মতাদর্শ নিয়ে লড়ে চলেছেন এবং তাদের লড়াইতে রয়েছে বহুজন জনগণেরই সিংহভাগ উপস্থিতি। বস্তুতঃ চরিত্রের দিক দিয়ে দুটি পথই শ্রেণী সংগ্রামের ও একই সাথে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম। বহুজন আন্দোলনের এই ক্রান্তিকালের দাবী হল পেরিয়ার-ফুলে-রোকেয়া-আম্বেদকারের মতাদর্শের সাথে বিপ্লবী বামপন্থী মতাদর্শের আন্তসম্পর্ক অনুসন্ধান করার ও একে অপরের থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলি গ্রহন করার।

প্রথম ধারার মধ্যে আম্বেদকারই একমাত্র বামপন্থী আদর্শের সাথে কিছু মতপার্থক্য রেখে গেছিলেন, এবং আম্বেদকরবাদই এই ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় মতাদর্শ। পেরিয়ার বেশ কিছু বামপন্থীদের ঘনিষ্ঠই ছিলেন (এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে সেই সময়ের বামপন্থী নেতৃত্ব ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী কোনো ভাবনা বা কর্মসূচী হাজির করতেও পারেন নি এবং তারা তা চেষ্টাও করেন নি বরং ব্রাহ্মণ্যবাদ দ্বারাই প্রভাবিত থেকে বামপন্থার থেকেই দূরেই অবস্থান নিয়েছিলেন) তাঁর লেখা পড়ে বামপন্থার সাথে মতপার্থক্য নয় বরং সমর্থনই পাওয়া যায়, ফুলে বা রোকেয়া এ নিয়ে কিছু লিখে যান নি। এদের মধ্যে আম্বেদকর ছাড়া আর কেউই সেভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদের অর্থনৈতিক চরিত্রটির দিকে আলোকপাত করে যান নি। তারা সবাই জোর দিয়েছিলেন সাংস্কৃতিক দিকটিতে, অমর্যাদা ও অসম্মানের দিকটিতে। আসলে অমর্যাদা ও অসম্মানের যে পাহাড় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বহুজন জনগণের বুকের ওপর চাপিয়ে রেখেছে হাজার বছর ধরে সেই পাহাড়ের নীচে লুকিয়ে থাকা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যকে দেখতে পাওয়া সহজও ছিল না। অন্যান্যদের প্রচেষ্টার পর্বগুলি পার হওয়ার মাধ্যমেই আম্বেদকর তার কাছাকাছি পৌঁছল। এখানেই আম্বেদকরের কৃতিত্ব। আর এই কৃতিত্বের মাধ্যমেই আম্বেদকরবাদ বামপন্থী মতাদর্শের অনেক কাছাকাছি চলে আসে, কারণ বামপন্থী মতাদর্শ মনে করে অর্থনৈতিক শোষণই হল সব ধরনের শোষণের ভিত (অন্যান্য শোষণগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ তা নয়)। কাছাকাছি অবস্থান করলে আম্বেদকর বামপন্থী মতাদর্শের প্রতি কিছু মতপার্তক্য রাখেন, মূলতঃ ২ টি বিষয় ছিল এই মতপার্থক্য— (১) একদলীয় শাসন; (২) হিংসা। বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ইতিহাসের স্বাপেক্ষে আমরা আলোচনা করে দেখব এই মতপার্থক্য কোন মতাদর্শ সঠিক, আম্বেদকরবাদ না বামপন্থা।

আলোচনা শুরু করার আগে এটা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার যে এই আলোচনার উদ্দেশ্য কোনোভাবেই বহুজন মুক্তির দিশায় বাবাসাহেব আম্বেদকরের অবদানকে খাটো করা নয়, বরং তার অনস্বীকার্য অবদানকে স্বীকার করে নিয়েই এই আলোচনা। বামপন্থী ভাবাদর্শের সাথে আম্বেদকর যে ২টি প্রধান মতপার্থক্যের উল্লেখ রেখে গেছেন তার ১টি হল বিপ্লব পরবর্তী সমাজে একদলীয় শাসনের বিষয়টি। এক দলীয় শাসন প্রকৃত অর্থে শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কত্ব, যা ভারতের মতো আধা-সামন্ততান্ত্রিক, আধা-ঔপনিবেশিক দেশে সমস্ত শোষিত জনতার একনায়কত্বের প্রতিনিধি। এখানে এই শ্রমিক শ্রেনীর একনায়কত্ব বা সমস্ত শোষিত মানুষের একনায়কত্বর ভাবনাটিতেই প্রধান। এক দলীয় শাসনের ভাবনাটি নয়। কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিক শ্রেনী ও সমস্ত শোষিত মানুষের প্রতিনিধি করে থাকে বলেই ঐ একদলীয় শাসনের কথাটি ওঠে (এখানে কমিউনিস্ট পার্টি বলতে বিপ্লবী কমিউনিস্ট পার্টির কথা বলা হয়েছে, কমিউনিস্ট মুখোশ পরা শাসকের দালালদের কথা বলা হয় নি) এবং এই একনায়কত্ব এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। যদি আমরা ইতিহাসের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব যে এই উপমহাদেশে আর্য আগ্রাসনের সাথে সাথেই প্রায় শুরু হয় ব্রাহ্মণ্যবাদের একনায়কত্ব, সমস্ত অধিকার থেকে দলিত-আদিবাসীদের বঞ্চিত করে তাদের শুধুমাত্র উচ্চবর্নের দাস-দাসীতে পরিনত করে রাখার ইতিহাস তারপর থেকেই চলে আসছে। সামান্যতম প্রশ্ন তোলা, প্রতিবাদ করা ও ব্রাহ্মণ্যবাদের বেঁধে দেওয়া ছকের বাইরে গেলেই দলিত-আদিবাসীদের ওপর নেমে এসেছে চরম প্রশাসনিক দমন। শাস্ত্র পাঠ করার ‘অপরাধে’ রামের শম্বুক হত্যা, অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হবার জন্য একলব্যর আঙুল কেটে নেওয়া যার অন্যতম উদাহরণ। এই শোষণ ও সাথে অমর্যাদা-অসম্মানের পরম্পরা সহ্য করে করে দলিত-আদিবাসীরা ধর্মান্তরিত হয়েও রেহাই পান না। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই চলমান একনায়কত্বের প্রতিকার বহুজন জনতার একনায়কত্বেই সম্ভব। আর ভারতে ৮৭ শতাংশ বহুজন জনতার একনায়কত্বই হলো প্রকৃত গণতন্ত্র বিল্পবী বামপন্থী মতাদর্শ অনুযায়ী সমস্ত শোষিত মানুষের একনায়কত্ব পক্ষান্তরে বহুজন জনতার একনায়কত্বই। কারণ ভারতে শোষিত মানুষের সিংহভাগই হলেন বহুজন। তবে জাতি-বর্ণে বহুজন কিন্তু শোষক কিছু মানুষও নিশ্চয় আছেন, যারা ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁবেদারে পরিণত হয়েছেন। তারা যে কোনো ব্রাহ্মণের চেয়েও বড় ব্রাহ্মণ। শোষিত মানুষের একনায়কত্ব চলবে তাদের ওপরও। যারা বহুজন হয়েও বহুজন জনতাকে সন্ত্রাস চালিয়ে উচ্ছেদ করতে চান তাদের জল-জঙ্গল-জমির থেকে — হত্যা করেন — কারারুদ্ধ করান নিজেদের বহুজন ভাই-বোনদের, তারা আম্বেদকরের সেই শিক্ষা সমাজকে ফিরিয়ে দাও, থেকে বিচ্যুত। তাদের বহুজন বলে স্বীকার করে না আম্বেদকরবাদ। বহুজন আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক আম্বেদকরবাদী সাথীরাই ঠিক করুন ঐতিহাসিক শিক্ষাকে গ্রহণ করে একনায়কত্বের ধারনাকে তারা ঠিক বলে মানবেন কিনা? বস্তুত আম্বেদকরের আকাঙ্খিত ‘সুরাজ’ (শূদ্র রাজ) আসলে একনায়কত্ব ছাড়া প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

বামপন্থার সাথে আম্বেদকরবাদের দ্বিতীয় মতপার্থক্যের বিষয়টি হল হিংসার প্রশ্ন। বামপন্থা দ্বিধাহীনভাবে ঘোষনা করে যে হিংসা ও বলপ্রয়োগের দ্বারাই শোষিত জনগণ শোষকদের উৎখাত করবেন। যে কোনো শান্তিপ্রিয় মানুষের কাছেই এই বিশ্বাস খুব নির্মম লাগতে পারে। কিন্তু ইতিহাস ও ঘটমান বাস্তবতা কি আর কোনো পথ খোলা রেখেছে? শম্বুক হত্যা, একলব্যর আঙুল কেটে দেওয়া যেখানে গর্ব ভরে উচ্চারিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকদের কণ্ঠে, সেখানে হিংসার মাধ্যমে

প্রতিরোধ ছাড়া পথ কি শোষিত বহুজন জনতার কাছে। এক ব্রাহ্মণ্যবাদ তাত্ত্বিক মোহদাস করমচাঁদ গান্ধী বলেছিলেন— ''একটা চোখের বদলে আরেকটা চোখ সমাজকে অন্ধ করে দেবে।'' ধূর্তভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদ এভাবেই শান্তির বাণী ফেরি করে আস্তিনে ছুরি লুকিয়ে। বিপ্লবী হিংসা কখনোই বদলা নয় যে চোখের বদলে চোখ চাইবে, এ হল প্রতিরোধ যুদ্ধ। যে যুদ্ধ শোষিত জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে শাসক, আদি অনন্তকাল ধরে। ইতিহাসের দিকে তাকালে ঐ সব ব্রাহ্মণ্যবাদী হিংসার কোনো জবাব কি আমরা খুঁজে পাই বিপ্লবী হিংসা ছাড়া? শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের কি হাল হয়েছে তা আমরা বারবারই দেখেছি। দেখেছি চার্বাকদের পরিণতি, চৈতন্যের অন্তর্ধান (সেটা খুন হবার সম্ভবনাই বেশি), গৌতম বুদ্ধ ও চৈতন্যকে ব্রাহ্মণ্যবাদী অবতার দানের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধী এই আন্দোলনগুলিকে গিলে খাওয়া।

সুদূর ইতিহাস থেকে অদূর অতীতে নেমে এলে আমরা আরো ভালো করে দেখতে পারব ব্রাহ্মণ্যবাদী হিংসার চেহারাটাকে। ১০ বছর পার করলাম আমরা গুজরাট সংগঠিত সংখ্যালঘু গণহত্যার। ইন্টারনেটের সাহায্যে সংখ্যালঘুদের বাড়িগুলি চিহ্নিত করে চালানো ঐ গণহত্যাকে নিশ্চয় আমরা ভুলে যাইনি। দাঙ্গার নামে বারবারই সংখ্যালঘু নিধন যজ্ঞে নেমেছে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসকরা। বিহার-ঝাড়খন্ডে-উত্তর প্রদেশের গ্রাম -গ্রামান্তর দাপিয়ে বেরিয়েছে রনবীর সেনা, ভূমি সেনার মতো উচ্চবর্ণের জোতদারদের বেসরকারী সেনা। খুন-ধর্ষণ-গ্রাম পোড়ানোর রেকর্ড স্থাপন করেছে তারা। বাথানিটোলা-আরওয়াল-জাহানাবাদ গণহত্যার মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছে বহুজন জনতার মৃতদেহের স্তুপ। লক্ষ্য করুন পাঠক-পাঠিকা এই বেসরকারী সেনা একই সাথে উচ্চবর্ণ ও জমিদার-জোতদারদের স্বার্থ রক্ষা করে, ব্রাহ্মণ্যবাদের অর্থনৈতিক দিকটার স্পষ্ট প্রমাণ। দীর্ঘ আন্দোলনের পর অগুনতি খুন-ধর্ষন-অপহরণ-সম্পত্তি ধ্বংসের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয় রনবীর সেনার প্রধান ব্রজেশ্বর সিং। গত বছর পাটনা হাইকোর্ট তাকে জামিনে মুক্তি দেয়। কিন্তু রনবীর সেনা ভূমি সেনার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বামপন্থী কর্মীরা জেল খাটছেন হাজারে হাজারে, মৃত্যুদন্ডেও দন্ডিত হয়েছিলেন বেশ কয়েকজন। রাষ্ট্রীয় সশস্ত্র বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা ও বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনী কাজ করে চলেছে ব্রাহ্মণ্যবাদের স্বার্থে। চালাচ্ছে হিংসাত্মক আক্রমণ। সেখানে জবাব দেওয়ার পথ কি? হয়ত পথ দেখাচ্ছে বিহার-ঝাড়খন্ডই, যেখানে তিরিশ বছর ধরে সশস্ত্র প্রতিরোধের মাধ্যমেই বামপন্থীরা ভেঙ্গে দিয়েছেন রনবীর সেনা, ভূমি সেনার মতো বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীগুলিকে। পাটনা হাইকোর্ট থেকে জামীনে মুক্তি পাওয়ার পরদিনই নিজের বাড়ীর সামনে খুন হয়ে যান ব্রজেশ্বর সিং। সেদিন বিহার-ঝাড়খন্ড তো বটেই বাংলার বিহারী বস্তিগুলিতেও অকাল দেওয়ালী নেমে এসেছিল। এখন বিহার ঝাড়খন্ডে বেসরকারী সশস্ত্র বাহিনীর জায়গা নিতে নেমেছে সরকারী সশস্ত্র বাহিনী, পুলিশ-সি.আর.পি.এফ.-কোবরা। গত তিরিশ বছরের সংগ্রাম যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী জমিদার-জোতদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে বন্টন করেছে বহুজন কৃষকদের মধ্যে, যা ব্রাহ্মণ্যবাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিতেই কামান দেগেছে। তাকে রুখে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদকেই পূণঃপ্রতিষ্ঠিত করতে নেমেছে সশস্ত্র সরকারী বাহিনী। হিংসার পথ এড়ানোর পথ আছে কি? উত্তরটা ভাবার সময় এসেছে।

একথা খুবই সত্যি কথা যে, ''বিশ্বের সবচেয়ে এগিয়ে থাকা মতাদর্শের বাহক'' বলে নিজেদের দাবী করা বামপন্থী কর্ম্মীরা বহুদিনই হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদ নামক এক ফ্যাসিস্ট মতাদর্শটিকে নিয়ে সঠিক ভাবনা ও কর্মসূচী হাজির করেন নি। কিন্তু, সাতের দশকের শেষ থেকেই তারা এ নিয়ে গবেষনা শুরু করেন। শিবরাম চক্রবর্তী, কোসাম্বী, রাহুল সংকীর্তায়ন, দেবীপ্রসাদ, দামোদরনের মতো বামপন্থীরা যদিও বিভিন্ন সময় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও জাতি-বর্ন ব্যবস্থাকে নিয়ে ভাবনা চিন্তা হাজির করেছেন তবু একটা বড় সময় ধরেই ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাথে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক বিপ্লবের আন্তর্সম্পর্কটি ধরতে পারেন নি বামপন্থী কর্মীরা। এবং অবশ্যই একথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে আম্বেদকর-পেরিয়ার-ফুলে-রোকেয়াদের ভাবনার সাহায্যেই গড়ে উঠেছে বামপন্থীদের ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের রূপরেখা। যে কর্মীরা ভারতে সংগ্রাম গড়ে তুলতে চান তাদের অবশ্যই এখনও শিক্ষা নিতে হবে আম্বেদকর-পেরিয়ার-ফুলে-রোকেয়ার রচনাবলী থেকে এবং বহুজন মুক্তি আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। তেমনই এদের যে সাচ্চা অনুগামীরা বহুজন মুক্তি আন্দোলনের প্রতি আন্তরিক তাদেরও একথা স্বীকার করতে হবে যে, যে কোনো মতাদর্শেই নানা পর্যায়ের মাধ্যমে আগের ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উন্নত হয়, আম্বেদকরবাদ-পেরিয়ারবাদের ক্ষেত্রেও তা সত্য, এই মতাদর্শগুলিরও ঐতিহাসিক সীমাবদ্ধতা আছে, তাকে কাটিয়ে উন্নত করতে হবে বহুজন মুক্তি আন্দোলনের মতাদর্শকেই। আর তা করতে গেলে এ সংক্রান্ত বামপন্থী কর্মীদের ভাবনার সাথে পরিচিত হতে হবে তাদের, এদের কর্মসূচী ও ভাবনার থেকে শিক্ষাও নিতে হবে।

বামপন্থীদের সম্বন্ধে কিছু অভিযোগ খুব শুনতে হয় বহুজন আন্দোলনের সাথীদের থেকে। যার একটি উঠে আসে কিছু ভন্ড বামপন্থীদেরই বামপন্থার প্রকৃত প্রতিনিধি ধরে নেওয়া থেকে। যারা বামপন্থার নামাবলী গায়ে চাপিয়ে মরীচ ঝাঁপিতে দেশের সবচেয়ে বড় দলিত গণহত্যার কুশীলব, যারা নন্দীগ্রাম-লালগড়ে বহুজন জনগণকে গুলি করে হত্যা করেন তারা বামপন্থী নন। এদের বামপন্থী ভাবলে ভুল হবে। এরা ব্রাহ্মণ্যবাদ সহ সমস্ত শাসকদের দালাল মাত্র। আরেকটি অভিযোগ হল বামপন্থীদের নেতৃত্বে বসে আছেন উচ্চবর্ণ হিন্দুরাই। কিছু দূর পর্যন্ত এটি একটি সত্য হলেও অভিযোগ হিসেবে সঠিক নয়। কারন পদবী দিয়ে যদি আমরা মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্নয় করতে বসি তবে মান্যতা দেওয়া হবে জন্ম নির্ধারিত ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাকেই। এবং তার সাথে অবশ্যই এটাও মাথায় রাখা দরকার যে নিছক ক্ষমতার ভাগ পাওয়ার জন্য যখন জন্ম সূত্রে বহুজন কিছু মানুষ ব্রাহ্মণ্যবাদের তাঁবেদারে পরিণত হচ্ছেন, তখন নৈতিকতার খাতিরেই কিছু জন্মসূত্রে উচ্চবর্ণ মানুষও বহুজন-শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নিতেই পারেন। আর আমরা যদি গত ৩০—৪০ বছরে বামপন্থীদের ক্রিয়াকলাপ গুলিকে একটু গভীরভাবে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে তাদের আন্দোলনে—সংগঠনে বহুজন জনগণের অংশগ্রহণই সিংহভাগ। ভারতের মতো দেশে শোষিত মানুষদের সংগঠনে সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। এমনকি এই অংশগ্রহণের পরিমাণটা যে কোনো বহুজন সংগঠনের চেয়ে খুব কম নয়, বরং বেশিই বেশ কিছু ক্ষেত্রে। বামপন্থীদের নেতৃত্বেও বহুজন জনগণের সংখ্যা বাড়ছে, সেটা আরেকটি ভাল লক্ষন।

শেষের কথা হিসেবে একটি বাস্তবতা তুলে ধরতে চাই, যা ঐতিহাসিক সত্য, ১৯৪৭ সালের পর থেকে বেশ কিছু বহুজন মানুষ প্রশাসন-রাষ্ট্র-সরকারের ক্ষমতাশালী পদে আসীন হওয়ার পরও বহুজন জনগনের অবস্থা একবিন্দু পাল্টায় নি, কিছু বহুজন মানুষের ক্ষমতায়ন নয়, দরকার সামগ্রিকভাবে বহুজন জনতার ক্ষমতায়ন বর্তমানে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদী রাষ্ট্র বহুজন জনতার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষনা করেছে তাতে সমস্ত শোষিত মানুষদের প্রতি আন্তরিক সাথীদের এক হয়ে লড়ে

এই যুদ্ধে জেতার মাধ্যমেই ঘটতে পারে শোষিত ও বহুজন জনতার সামগ্রিক ক্ষমতায়ন। আসুন বামপন্থী কর্মী ও সাচ্চা আম্বেদকরবাদী-পেরিয়ারবাদীরা গড়ে তুলি এক শ্রেণী-জাতি-বর্ণহীন সমাজ, এক নতুন ভারত।

''জয় ভীম কমরেড''

ভারতের তপসিলি জাতি – উপজাতির সংরক্ষণের চালচিত্র

সুনীল কুমার রায়

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার রিপোর্ট অনুসারে জনসংখ্যার ১৬% তপসিলি জাতি এবং ৯% তপসিলি উপজাতিবর্গের মানুষ। ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনায় এঁরা ছিলেন যথাক্রমে ১৫% এবং ৬%। দ্রুত ক্রমাবনত অর্থনৈতকি, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে তপসিলি জাতিবর্গের মানুষেরা তাঁদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে আটটি দশমবার্ষিক জনগণনার শেষেও জাতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারে কার্যত আটক রেখে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমাজতাত্ত্বিক বিধিকে যে ভুল প্রমান করে দিয়েছেন তা বিশ্বাস করা কঠিন। বাস্তবত তা সত্য নয়। তপসিলি জাতি-উপজাতির সংরক্ষণের সুযোগ যাতে প্রসারিত না-করতে হয় সেই প্রচেষ্টাই ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের জনগণনার রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে। বেসরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ভারতের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি মানুষ তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির অন্তর্ভুক্ত এবং তাঁদের জনসংখ্যা চীনব্যতীত পৃথিবীর আর যে কোন দেশের মোট জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি। ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের চালকদের অবজ্ঞা, প্রতারণা, হিংস্রতা এবং দস্যুতার শিকার এই বিপুল সংখ্যক মানুষের দুর্বিষহ জীবনের গ্লানিমা কি সরকারি জনগণনার কারচুপিতে চাপা থাকে?

—না থাকে না। তাই তো তাঁদের গৃহহীনতা, ক্ষুধাকাতরতা, অপুষ্টি, রোগব্যধি, চিকিৎসাহীনতা, অনাহারমৃত্যু, শিশু ও প্রসূতিমৃত্যু সারা পৃথিবীর, কলঙ্কের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ভারতের মত এমন বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ বিশাল দেশের প্রত্যক্ষ শ্রমশক্তির এত দীন-হীন অবস্থা কেন হল? বিশেষত সংরক্ষণের সুযোগপ্রাপ্ত এই স্রষ্টাকুলের তো সেই কবে সর্বতোভাবে অগ্রসর হয়ে উঠে সংরক্ষণ ব্যবস্থাকে বিদায় জানানোর কথা ছিল। কেন তা না–হয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ফলে গেল? দিল্লি কেন্দ্রিক গবেষণা সংস্থা The Centre for Budget and Governance Accountability বা সংক্ষেপে CBGA এই প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট তথ্যভিত্তিক উত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছিলেন। এই সংস্থার গবেষকদের অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ১৯৮০–এর দশকের সূচনাকাল পর্যন্ত তপসিলি জাতি-উপজাতিসমূহের সমূহের উন্নয়নের খাতে ব্যয়বরাদ্দের কোন নির্ধারিত নীতি না-থাকায় উপযুক্ত পরিমাণে অর্থের সংস্থানই ছিল না বলে তাঁদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন উদ্যোগও ছিল না। তাই তখন কেন্দ্রীয় সরকার তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য বাজেট বরাদ্দের অংশ ভাগ তাঁদের উন্নয়নের জন্য বাধ্যতামূলকবাবে ব্যয় করার নীতিটি নির্ধারণ করেন। ঠিক হয় যে, অতঃপর প্রতিটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক তপসিলি জাতিগুলির জন্য The Special Component Plan (SCP) এবং তপসিলি উপজাতিগুলির জন্য The tribal Sub-Plan (TSP) তৈরী করে সেই ব্যয়-বরাদ্দের অর্থ বাধ্যতামূলকভাবে খরচা করবেন।

অত্যন্ত বেদনাদায়ক সত্য হল এই যে, গত তিনদশক ধরে দেন্দ্রীয় সরকার সেই নীতি কার্যকর করেন নি এবং সেই দুর্গত মানুষদের প্রাপ্য অর্থ তাঁদের উন্নয়নে খরচ করা দূরে থাক, অর্ধেকও বরাদ্দই করেন নি। ["Putting two key central goverment policies related to

dalits and tribals under the scanner, CBGA researchers found that these have remained on paper. These policies are the Special Component Plan (SCP) for scheduled castes and the Tribal Sub-Plan (TSP) for scheduled tribals. Started there decades ago, they made it mandatory for central goverment ministries and department to earmark a fixed share of thier spending for dalits and tribals in proportion to the population. This meant that each agency needed to exclusively spend 16% of their funds on dalits and 9% on tribals." -- The Times of India, Kolkata, 15.03.2012, p14]

গবেষকগণ তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির অগণিত মানুষকে অমানবিক স্তরের জীবনযাত্রায় নিক্ষেপ করার দায়ে ক্ষমতাধর সব রাজনৈতিক নেতাকেই অভিযুক্ত করেছেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁদের প্রতারণা এবং দস্যুতার পর্যায়ে ফেলেছেন।

এই গবেষকদের বিশ্লেষিত তথ্যাবলি থেকে জানা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র ২০১০–১১ এবং ২০১১–১২ অর্থবর্ষদ্বয়ে সরকারি হিসাবে গণিত তপসিলি জাতি ও উপজাতির মানুষেরা সরকারি হিসাবে প্রাপ্তব্য প্রায় আশি হাজার কোটি টাকা থেকে প্রবঞ্চিত হয়েছেন।

চার্ট ঢুকবে.....

অর্থাৎ এই গবেষনার ফলাফল নিম্নোক্ত নির্মম সত্য বিষয়গুলিকে আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরছে—

(১) স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের শাসক দলগুলি কখনই তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের উন্নয়নে আগ্রহী ছিলেন না।

(২) সাংবিধানিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকে ঐ পশ্চাদপদ জাতিগুলির উন্নয়নের জন্য তাঁদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে প্রাপ্য অংশের বেশিরভাগই তাঁদের উন্নয়নে ব্যয়িত না–হয়ে অর্থনৈতিকভাবে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তদের পোষণে ব্যয়িত হয়ে চলেছে। তার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে (৩) হৃতসর্বস্ব তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলি তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে ধারাবাহিকভাবে বঞ্চিত হয়ে ক্রমশ অধঃপতিত জীবনযাত্রায় পর্যবসিত হচ্ছেন।

এ যে মারাত্মক ব্যাপার! আজ পর্যন্ত প্রায় সকলেই জানেন যে, অ-তপসিলি জনগণের প্রাপ্য বাজেট বরাদ্দের অংশভাগ থেকে বেশ কিছু পরিমাণে টাকা কেটে নিয়ে তা তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের প্রাপ্য অংশভাগের সঙ্গে জুড়ে পাওয়া ব্যয়বরাদ্দের টাকায় শেষোক্ত মানুষদের পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে তোলার জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাটি প্রচলিত রয়েছে। আর সেই জন্যই তো উদারমনা ভদ্রলোকেরা এমন একটি মহৎ প্রয়াসে নিজেদেরও অবদান আছে ভেবে যথেষ্ট তৃপ্তিবোধ করতেন এবং হিংসুটে ভদ্রলোকেরা হিংসেয় জ্বলেপুড়ে যেতেন। এখন তো বোঝা যাচ্ছে যে, সর্বসাধারণের জানা এই কথাটি আদৌ সত্য নয়, বরং সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনাটিই সত্য অর্থাৎ নিঃস্ব রিক্ত তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির প্রাপ্য এক বড় অংশের টাকায় বস্তুত পুষ্ট হয়ে চলেছেন উচ্চ ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা।

জানি অনেকে বিষয়টির সত্যতায় সংশয় প্রকাশ করছেন। তাঁদের কাছে একান্ত অনুরোধ, পুরোনো তথ্যের কথাটা ছেড়ে দিন, এবারের বাজেটে দেখুন তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির জন্য যথাক্রমে ১৬% এবং ৯% টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধার্য হয়েছে কিনা; দেখবেন, তা ধার্য হয়নি এবং রিক্ততম তপসিলি উপজাতিগুলিই কেবল ২৩ হাজার কোটি টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

আমরা নিশ্চিত, বিবেকবান ভদ্রলোকেরা সমাজের পশ্চাদপদ অংশের মানুষের প্রতি এমন জঘন্য প্রতারণার শরিক হতে চান না; শুধু এর আগে বিষয়টি তলিয়ে দেখেন নি বলে কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নি। স্বাভাবিক কারণে তাই প্রশ্ন জাগে—

বিষয়টিকে বিশিষ্টজনেরা ইতিপূর্বে গুরুত্ব দিয়ে ভেবে দেখেন নি কেন? তাঁদের না-ভাবার কারণ এই যে, তাঁরা একটু আগে উল্লেখ করা ধারণাটি পোষণ করতেন। বস্তুত সেটি ছিল শিল্পবিপ্লবের ইউরোপীয় সংরক্ষণের ধারণা। অব্যবহিত পরবর্তীকালের কলে-কারখানায় উৎপন্ন বিপুল পরিমানের পণ্যের বাজার তৈরীর স্বার্থে বৃহৎ রাষ্ট্রের এবং ক্রমবর্ধমান ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন অধিক সংখ্যক ক্রেতার প্রয়োজন মেটানোর জন্য তখন ইউরোপে জাতিরাষ্ট্রের (যেমন ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং আয়ারল্যান্ড মিলে ইউনাইটেড কিংডম) এবং সেই জাতিরাষ্ট্রের অনগ্রসরদের সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়েছিল। উপযুক্ত পরিকল্পনা সার্থকভাবে রূপায়নের ফলে সেখানে অবিলম্বে সংরক্ষণের প্রয়োজন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার যেসব দেশে বহুজাতিক জাতিগত বৈষম্য বিদ্যমান ভারতের মত সংরক্ষণ ব্যবস্থা সেসব দেশে এখনও চলছে। সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে জাপানেও।

ভারতে আধুনিক সংরক্ষণের প্রবর্তন ঘটেছিল ব্রিটিশ আমলে তবে তা পূর্বেকার ইউরোপীয় উদ্দেশ্যে নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশরা এদেশের পশ্চাৎপদ অংশের নিপীড়িত মানুষদের রাষ্ট্রশাসনের কার্যকরী ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করে রাখার উদ্দেশ্যেই সংরক্ষিত করেছিলেন। ভারতবাসীদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা অর্পণ করার উদ্যোগপর্বে The Government of India Act 1935-এ এদেশের নিপীড়িত মানুষদের তপসিলি জাতিবর্গ (Scheduled Castes) এবং তপসিলি উপজাতিবর্গ (Scheduled Tribes) নামে অভিহিত করে তাঁদের জন্য যথাক্রমে ১৫% এবং ৬% সরকারি চাকরি এবং যৌথ নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের আইনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের রাজত্বের সূচনায় তাঁরা যে কৃষক ও অরণ্যবাসীদের জমি ও অরণ্য কেড়ে নিয়ে জমিদার ও করদরাজাদের উপঢৌকন দিয়েছিলেন তা অলঙ্ঘ্যনীয় করে রেখে চাষি কৃষক ও অরণ্যবাসীদের প্রতারণাকে চিরস্থায়ী করে দিয়েছিলেন।

একথা স্বীকার না করে কোন উপায় নেই যে, আইনে (১৯৩৫) স্বীকৃত সেই সংখ্যক চাকুরি ব্রিটিশ আমলে তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির মানুষেরা কোন দিনই পাননি এবং নির্বাচনে তাঁদের যেসব রাজনৈতিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁরা, দু'একটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, কখনও নিপীড়িত মানুষদের স্বার্থরক্ষায় দৃপ্তভূমিকা পালনও করতে পারেন নি। তার ফলে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতার নামে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের হাতে অর্পিত হওয়ায় তপসিলি জাতি-উপজাতিরা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসক-শোষকদের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ্য

সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতায় দেশীয় পুঁজিপতিদের অতিলোভাতুর শোষণ-শাসনের শিকার হয়েছেন। সুতরাং তাঁদের জীবনমানের ক্রমাধোগতি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। তাঁরা স্বাদীন ভারতের সংবিধানেও তপসিলি জাতি-উপজাতিবর্গের আখ্যা এবং সংরক্ষণ ব্রিটিশ আমলের উত্তরাধিকাররূপেই পেয়েছিলেন।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনা কমিটির চেয়ারম্যান ''ড. আম্বেদকর নিজে সংরক্ষণের বিরোধী ছিলেন, তিনি এটাকে নির্ভরশীল হয়ে থাকার একটা যন্ত্র হিসাবে গণ্য করেছিলেন; কিন্তু সংবিধান যখন রচনা হয় তখন জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা তাঁকে ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা বলবৎ রাখার কথা বলে রাজী করান।'' (কুলদীপ নায়ার, দলিতদের জন্য সংরক্ষণে আপত্তি ছিল আম্বেদকরের। ড. আম্বেদকর তখন কী বুঝেছিলেন অথবা চেয়েছিলেন তার কোনো রের্কড আমাদের হাতে নেই; তবে ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, শিল্পবিপ্লবোত্তর ইউরোপীয় ধারার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে বিরাট সংখ্যক পশ্চাৎপদ ভারতবাসীর স্বাধীন মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আর আমরা আরও জানি যে, ভারতের সংবিধানের নির্ধারক নীতিসমূহের (The Directive Principles) তালিকায় সেই কর্মসূচি প্রসঙ্গে কোন উল্লেখই নেই। এতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ব্রিটিশের উপযুক্ত তালিমপ্রাপ্ত নেহেরুজিরা এই বিপুল সংখ্যক মানুষকে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী শাসক-শোষককুলের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকার বা না থাকার অধিকারটিই দিতে চাননি, তোদের তপসিলি জাতি ও উপজাতিরূপে সংরক্ষিত অবস্থায় নির্ভরশীল হয়ে থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তার ফল হয়েছে এই যে, মাত্র ৬৫ বছরের নিরঙ্কুশ শোষণে ব্রাহ্মণ্য শাসককুল প্রত্যক্ষ শ্রমজীবী মানুষদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে নিজেদের ঘনিষ্ঠ চারটি পরিবারকে পৃথিবীর ১০ টি বিশাল ধনীপরিবারের মধ্যে স্থান করে দিয়েছেন আর পেটোয়া কত কত পরিবারকে হিসাব বর্হিভূত আয়ের অধিকারী করে বিদেশী ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় জমানোর সুযোগ করে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। শুধু গযতন্ত্রের ভড়ংটুকু বজায় রাখার জন্য যে রাষ্ট্রীয় হিসাব-নিকাশ না থাকালে নয় তার নিরিখে তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলির মানুষদের বর্তমান হীনতম জীবনাবসানের চিত্র একবার দেখে নেওয়া যাক।

চার্ট ঢুকবে.....

এই পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে, তপসিলি জাতি-উপজাতির মাত্র ২০.২ শতাংশ মানুষের খাওয়া-পরার নিশ্চয়তা আছে। কিন্তু ৭৯.৮ শতাংশ মানুষের নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যায়।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে চাষি কৃষক ও অরণ্যবাসী তো শ্রমকুশল, আত্মবিশ্বাসী ও স্বনির্ভর। তাই তাঁদের এমন করুণ অবস্থা হওয়ার কথা নয়! ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে (১৭৬৯–৭০ খ্রিঃ) বাংলার ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) মন্বন্তরেও তাঁরা বিকল্প সংগ্রহ করে বেঁচে ছিলেন। তখনও চাষের জমি, অরণ্য এবং জলাভূমি তাঁদের অধিকারে ছিল বলে বিকল্প খাদ্য উৎপাদন এবং সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে তাঁদের কোন বাধা চিল না। তাই তাঁরা তুড়ি মেরে সেই ভয়াবহ মন্বন্তরকে পার করে দিয়েছিলেন। জমির অধিকারহারা চাষি এবং অরণ্যের অধিকারহারা উপজাতি এখন ক্ষেতমজুর এবং জনমজুর। গত কয়েক বছরে সেই মজুরের কাজের সুযোগ কেমন ছিল তা একটু দেখে নিলেই শ্রমনিপুণ মানুষদের দুরবস্থার কারণটি মিলবে।

চার্ট ঢুকবে.....

ভারত সরকারের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের এই স্বীকৃতি থেকে জানা গেল যে, সাম্রাজ্যবাদের চূড়ামনি আমেরিকার ব্যাঞ্চ লাটে ওঠার দায়ভার বহনের ইজারাদার এই সরকার তার প্রায় পুরো দায়ভাগই তার পোষিত চোরকারবারি, রঙবেরঙের মাফিয়া, ধনী কৃষক এবং পুঁজিপতিদের উপর না-চাপিয়ে সমাজের পশ্চাৎপদ অংশের মানুষদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের উন্নয়নের জন্য ব্যয়-বরাদ্দের টাকায় সরকার আমেরিকার মন্দার আঘাত সামলে দিয়ে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। আর তার ফলে টাকার অভাবে নিরন্ন মানুষদের কাজের সুযোগটিই উবে গেছে বলে ক্ষিধের জ্বালা মিটানোর জন্য এক টুকরো রুটিও তাঁদের জোটেনি। রোগ-অপুষ্টি-অনাহারে যাঁরা অশক্ত হয়ে পড়েছেন তাঁরা মৃত্যুগহ্বরে মুখথুবড়ে পড়েছেন। এই অপমৃত্যুর তালিকার শীর্ষে রয়েছেন তপসিলি জাতি-উপজাতির নারীরা।

চার্ট ঢুকবে.....

সদ্যপ্রকাশিত The Human Development Report 2013 অনুসারে বহুমাত্রিক দারিদ্রসূচকের (Multiple Poverty Index) বিচারেও তাঁরাই সর্বাধিক প্রবঞ্চিত। ["Gender inequality in India among the worst in the world," The Times of India, Kolkata, March 18, 2013]

এই সরকার চোরাকারবারি, মুনাফাখোর মহাজন এবং নানা ধরনের মাফিয়াদের কীভাবে পোষণ করে চলেছেন তার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না-দিলে চলে না। সরকারের নিজের দেওয়া তথ্য একটু দেখা যাক।

চার্ট ঢুকবে.....

বাস্তব অবস্থা যখন এমনই ভয়াবহ তখন সরকারি নির্লজ্জ প্রচার কিন্তু তুঙ্গে যে ক্ষুধার বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ চলছে! তাহলে কি কায়েমি স্বার্থের ধ্বজাধারী লোভাতুর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রীদের লোভের ক্ষুধা মিটানোর জন্য সরকার প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ চালাচ্ছেন?

— সম্ভবত, হ্যাঁ। প্রদত্ত তথ্যাবলির ভিত্তিতে অন্য কোন উত্তর মেলা ভার।

এবার তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির যেসব মেধাবী সন্তান হিমালয়তুল্য প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গ্রাজুয়েট, পোষ্টগ্রাজুয়েট, পি.এইচ.ডি., এম.বি.এ. ইত্যাদি উচ্চতম ডিগ্রী অর্জন করেছেন তোদের কর্মসংস্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করা বিশেষ প্রয়োজন।

রূঢ় সত্য এই যে, তাঁরা কর্মহীন, বেকার এবং তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীয় নির্দেশে চালিত শিল্পোদ্যোগ, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা ইত্যাদিতে চিরকাল তাঁরা অবাঞ্চিত ছিলেন এবং এখনও অবাঞ্চিতই রয়েছেন তাঁরা কোটা নির্ধারিত সংরক্ষিত সরকারি পদেই কেবল অনন্ত টালবাহানার শেষে কালেভদ্রে দু'চারজন চাকরি পেতেন।

এখন থেকে ১৮ মাস আগেকার সংবাদে প্রকাশ যে, তপসিলি জাতি ও উপজাতির প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত ৩৫,০০০ পদ কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরসমূহে খালি পড়ে আছে এবং সেই পদগুলি পূরণ করার জন্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করতে চলেছেন ['Special Drive to fill Quata Vaccancies', The Times of India, Kolkata, November 20, 2011]। সেই উদ্যোগ কার্যকর হয়নি এখনো। ইতিমধ্যে অন্তত আরও ৫,০০০ খালি পদ সেই সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অধিকাংশ কেন্দ্রীয় সরকারি পদ থেকে তপসিলি জাতি ও উপজাতিগুলির উচ্চশিক্ষিত মানুষেরা বিতাড়িত হয়েছেন, বাকি যাঁরা আছেন তাঁরাও অচিরে বিতাড়িত হবেন এবং অতঃপর ঐ পদগুলি অপূর্ণই ফেলে রাখা হবে। সোজা কথায়, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রী সরকার তার অফিসগুলিকে ব্রাহ্মণ্যপদ্ধতি স্বীকৃত শুদ্ধিকরণের অঘোষিত কর্মসূচী পালনের পরিকল্পনা করেছেন বলে তাঁর কাজের ধারা থেকে অনুমিত হয়। এই প্রসঙ্গে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, তাঁরা আত্মঘাতী পথ ধরে এগিয়ে চলেছেন।

এতো জানা কথা যে, কোন দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি তার শ্রমশক্তির শ্রমে-ঘর্মে রচিত হয়। তার ফলে সবল শ্রমশক্তিই কেবল সবল অর্থনীতির বুনিয়াদ গড়ে তুলতে পারে। শ্রমশক্তিকে দুর্বল করে ভারতের শাসককুল দেশের অর্থনীতির বুনিয়াদ এবং সেই সূত্রে দেশে ঐক্য ও সংহতিকে বিপন্ন করে তুলেছেন। এভাবে চলতে থাকলে অনতিবিলম্বে দেশ খন্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে। দেশের শ্রমশক্তিকে সবল করে তুলে এখনও সেই বিপর্যয় রোধ করা যায়। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের জাতিরাষ্ট্রগুলির আদলে এবং তৎপরতায় ভারতের তপসিলি জাতি-উপজাতিগুলিকে সংরক্ষণের মাধ্যমে অচিরে অগ্রবর্তী স্তরে তুলে এনে সবল শ্রমশক্তিকে সংহত করা এখনও সম্ভব।

ভারতের ভ্রষ্টাচারী
শাসককুল কি তা বুঝবেন?